এখন ডুয়ার্স

১৫ জুলাই ২০১৬। ১২ টাকা

প্রশাসনিক অধিকার কতটা পাবে চা-ডাইরেক্টরেট?

ধান উৎপাদনে পিছিয়েই থাকবে তরাই-ডুয়ার্স?

উত্তরের পরিবহণে নতুন অধ্যায় শুরু হল

পর্যটনে কাজ করার কতটুকু সুযোগ পাবেন গৌতম?

মুখোমুখি একান্তে সুখবিলাস বর্মা

কোচবিহার জেলা হাসপাতালের 'একই অঙ্গে নানা রূপ'

facebook.com/ekhondooars ফেসবুকে যোগ দিন ও বন্ধুদের invite করুন

এক নাগাড়ে বৃষ্টি হল, বৃষ্টি মানে তুই
ইচ্ছে করে এই শ্রাবণে দু'হাত দিয়ে ছুঁই
বৃষ্টি তোকে নরম করে, বৃষ্টি শোনায় গান
এই বরষায় তোর শরীরে বুনেছি বীজধান!

এক নাগাড়ে বৃষ্টি হল, মাঠখানা থইথই
আমার ফলা বিঁধল তোকে - ভীষণ পুরুষ হই
আকাশ জুড়ে চমকালো বাজ, জল ভেঙে দেয় আল
পাগল পাগল শরীর আমার আজকে বেসামাল!

এক নাগাড়ে বৃষ্টি হল, বৃষ্টি ভেজায় ভুঁই
ভেজা মাটি লেপ্টে আমি হয়েছি বনরুই
পিঁপড়েগুলো ডিম বাঁচাতে কোথায় চলে যায়
এখন আমি পুঁতবো রোয়া তোমার শরীরটায়!

এক নাগাড়ে বৃষ্টি হল, বুক পেতে দিস্ তাই
বৃষ্টিফোঁটার সঙ্গে তোকে সবুজ দিয়ে যাই
বন-পাহাড়ের অগাধ হাওয়া ভরবে ধানের শীষ
সম্ভাবনার এই শ্রাবণে আমাকে তুই নিস্!

ছন্দে- অমিত কুমার দে
ছবিতে- অমিতেশ চন্দ

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (অন্তর্বর্তী সংস্করণ), ১৫ জুলাই ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৪

ধান উৎপাদনে পিছিয়েই থাকবে তরাই-ডুয়ার্স? ৮

ধান উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে তবু চাষির মন পাট ও আলুতেই ১০

অগত্যা আবার গৌতম! কিন্তু পর্যটনে কাজ করবার সুযোগ পাবেন কতটুকু? ১১

ফালাকাটা ও ময়নাগুড়িকে পৌরসভা ঘোষণায় এত গড়িমসি কেন? ১৪

দূরবিন

সেবা-উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশাসনিক অধিকার কতটা পাবে চা-ডাইরেক্টরেট? ১৬

এখন ডুয়ার্স

উত্তরের পরিবহণে নতুন অধ্যায় শুরু হল ১৯

খালি চোখে ডুয়ার্স

'মেডিক্যাল কলেজ' তকমার অপেক্ষায় কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল ২২

উত্তরের উজ্জ্বল মুখ

মুখোমুখি একান্তে সুখবিলাস বর্মা ২৬

প্রতিবেশীর ডুয়ার্স ২৮

পর্যটনের ডুয়ার্স ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৬
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৩৯
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪০
খেলাধুলায় ডুয়ার্স ৪১
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৬
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ৫০
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৫০

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩২
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৪
তরাই উৎরাই ৩৭

শ্রীমতী ডুয়ার্স

স্মৃতির ডুয়ার্স ৪২
এবারের শ্রীমতী ৪৪
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৯

ডুয়ার্সের কফি হাউস এখন জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

facebook.com/aaddaghar

ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী জলপাইগুড়ি পৌরসভা

১৯১১ সাল

জলপাইগুড়ি পৌরসভা আড়াই টনের লোহার রোলার কিনেছিল ৫০০ টাকা দিয়ে। পুর পরিষেবার সার্থে কিনতে হল তিনটে বলদ, পাঁচটা মহিষ। ওরা গাড়ি টানবে পুরসভার কাজের জন্য। তাদের জন্য গোয়াল ঘর বানাতে হল। খড়-ভুষি-লবণেরও ব্যবস্থা করতে হল। এ সবই ছিল পুরবাসীর স্বার্থে।

২০১৬ সাল

১০৫ বছর পর পুর পরিষেবার প্রযুক্তি কত বদলে গিয়েছে। কিন্তু মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। পুর পরিষেবার উন্নতি।

আমরা এক ইতিহাসের উত্তরাধিকারী।

মায়ের স্নেহ, মাটির আশীর্বাদ, মানুষের শুভেচ্ছা নিয়ে চলছি।

শ্রীমতি পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

চোরাশিকার বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই হোক এবার বনমহোৎসব

দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যের বন মন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার পর বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ মহাশয় স্বভাবতই পুলকিত চিত্তে কাগজে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বন নিয়ে প্রতিশ্রুতির লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। তার মধ্যে বৃক্ষরোপণ তথা বনসৃজন প্রথম স্থানেই রয়েছে। বনমহোৎসবে হাজার হাজার গাছের চারা বিধায়কদের মাধ্যমে বিলি করা হবে নানা প্রান্তে, যার উদ্দেশ্য রাজ্যে বনাঞ্চলের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা। পর্যটনে বন দপ্তরের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার কথাও বলেছেন বন মন্ত্রী— অনলাইন বনবাংলো বুকিং ইত্যাদি ইত্যাদি। বেআইনি গাছ কাটা ও চোরাই রুখতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানোর কথাও মাথায় এসেছে তাঁর। মানুষ ও বন্য প্রাণের নিত্যবর্ধমান সংঘাত অনিবার্য জেনেও তার দাওয়াই বাতলেছেন। হাতি রেলে কাটা পড়া নিয়েও তাঁর যথেষ্ট উদ্‌বেগ এবং তার প্রতিরোধক ভাবনাচিন্তার কথাও তিনি প্রকাশ করেছেন অতি আন্তরিকভাবেই। কিন্তু খানিক পরিতাপের সঙ্গেই বলতে হয়, চোরাশিকার বন্ধ করার কঠোর বাক্যবন্ধ তাঁর বক্তব্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ সবাই জানেন, উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে চোরাশিকার আজ বন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। হাতি মেরে দাঁত বা গন্ডার মেরে শিং কেটে নেওয়ার কথা জানতে পারি তাদের বড় বড় মৃতদেহ চোখে পড়ে যায় বলে। গোখরো বা তক্ষক কিংবা কচ্ছপ ধরা পড়ার খবর মাঝেমধ্যে খবরের কাগজে ছাপা হয় বলে জানা যায়। চেনাশোনা উচ্চপদস্থ বনকর্তাদের কাছেই শোনা যায়, ছোট ছোট আরও নানা প্রাণীর চোরাশিকার রোজই চলে ডুয়ার্সের জঙ্গলে, যেগুলি মারার পর পুরোটাই হাপিস হয়ে যায়। জোগান নিয়মিত রাখার জন্যই মাঝেমধ্যেই দু'-একটা গাড়ি আপনা-আপনি ধরা দেয়— এতে অফিসারদের মানও বাঁচে, তাঁরা যে হাত গুটিয়ে ঘুমান না, অন্তত সেটুকু প্রমাণিত হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, এই চোরাশিকারের নিয়মিত জোগান রাখতে যেমন বন সংলগ্ন গ্রামবাসীরা সহযোগিতা করে, তেমনই বন দপ্তরের কর্মীদের অজান্তে এই কাজ দিনের পর দিন করে যাওয়া কার্যত সম্ভব হয় না।

মাননীয় বন মন্ত্রী মশাই নিশ্চয়ই মানবেন, এইসব দুর্মূল্য বন্য প্রাণ ডুয়ার্সের জঙ্গলের সম্পদ। বাঘবনে বাঘ না পেলে ইজ্জত হয়ত খানিকটা খোয়া যায়, কিন্তু জঙ্গল বন্য প্রাণহীন হয়ে গেলে ক্ষতি তার চাইতে অনেক বেশি। বনকর্তাদের মতো তাঁকেও হালকা কাঁদুনি গাইতে শোনা গিয়েছে বনকর্মীর সংখ্যাল্পতার সমস্যা নিয়ে। কিন্তু বনকর্মী বাড়িয়েই যে চোরাশিকার রোধ করা যাবে, সে গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে? এর জন্য জঙ্গলের আশপাশের মানুষের সচেতনতা, বিকল্প আয়ের সংস্থান বাড়াতে এনজিও-গুলিকে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত করতে হবে দ্রুত। প্রতিবেশী আসাম রাজ্যের বন্য প্রাণ সংরক্ষণে সেখানকার এনজিও-গুলির অসাধারণ ভূমিকা খালি চোখেই দেখা যায়। তাদের কাজকর্মে সে রাজ্যের সরকারকে কখনওই নাক গলাতে দেখা যায়নি। বরং দুর্নীতিপরায়ণ বনকর্তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লেগে থাকায় বহু ক্ষেত্রেই সরকারকে সেইসব আমলাদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিতে দেখা গিয়েছে। আসাম সরকার যখন একবার সব গন্ডারের শিং কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল চোরাশিকারের দৌরাত্ম্য রুখতে, তখন এইসব এনজিও-ই পথে নেমে তার প্রতিবাদ করল, তখন কোনও রাজনৈতিক দল তাদের ঠেকাতে পথে নামেনি। শেষমেশ আসাম সরকার সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এ রাজ্যে বিনয়বাবুর দল বা সরকার সেই ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখাতে পারবেন? যদি তা পারেও, এখানকার এনজিও-রা তাদের ইকো টুরিজম প্রসারের সুখী অভ্যেস থেকে বেরিয়ে এসে চোরাশিকারের বিরুদ্ধে চোয়াল শক্ত করে নামতে পারবে কি?

বিনয়বাবুকে মানতেই হবে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর উদ্‌বেগের কারণ। এটা ঠিক কথা, বন্য প্রাণের ভোটাধিকার নেই। অতএব, সংগঠন ঠিক রাখলে আগামী নির্বাচনেও আপনি বা আপনারা আবার প্রচুর ভোটে জিতবেন, বিষয়টির গুরুত্ব সে ক্ষেত্রে কোনও ফ্যাক্টর হবে না। কিন্তু বন্য প্রাণ সংরক্ষণে আজই যদি 'চোরাশিকারির যম' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা না করতে পারেন, তাহলে আলাদা বনমন্ত্রক রাখার প্রয়োজনীয়তাও খুব শিগগির একদিন হারিয়ে যাবে, তখন পরিবেশমন্ত্রক থেকেই সামলে দিতে পারবে বন্য প্রাণহীন জঙ্গল। যত তাড়াতাড়ি আপনি এ নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করবেন এবং সেই টাস্ক ফোর্সকে সঙ্গে নিয়ে দেশের নানা প্রান্তের অরণ্যে ঘুরে চোরাশিকার রোধের অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, ততই মঙ্গল।

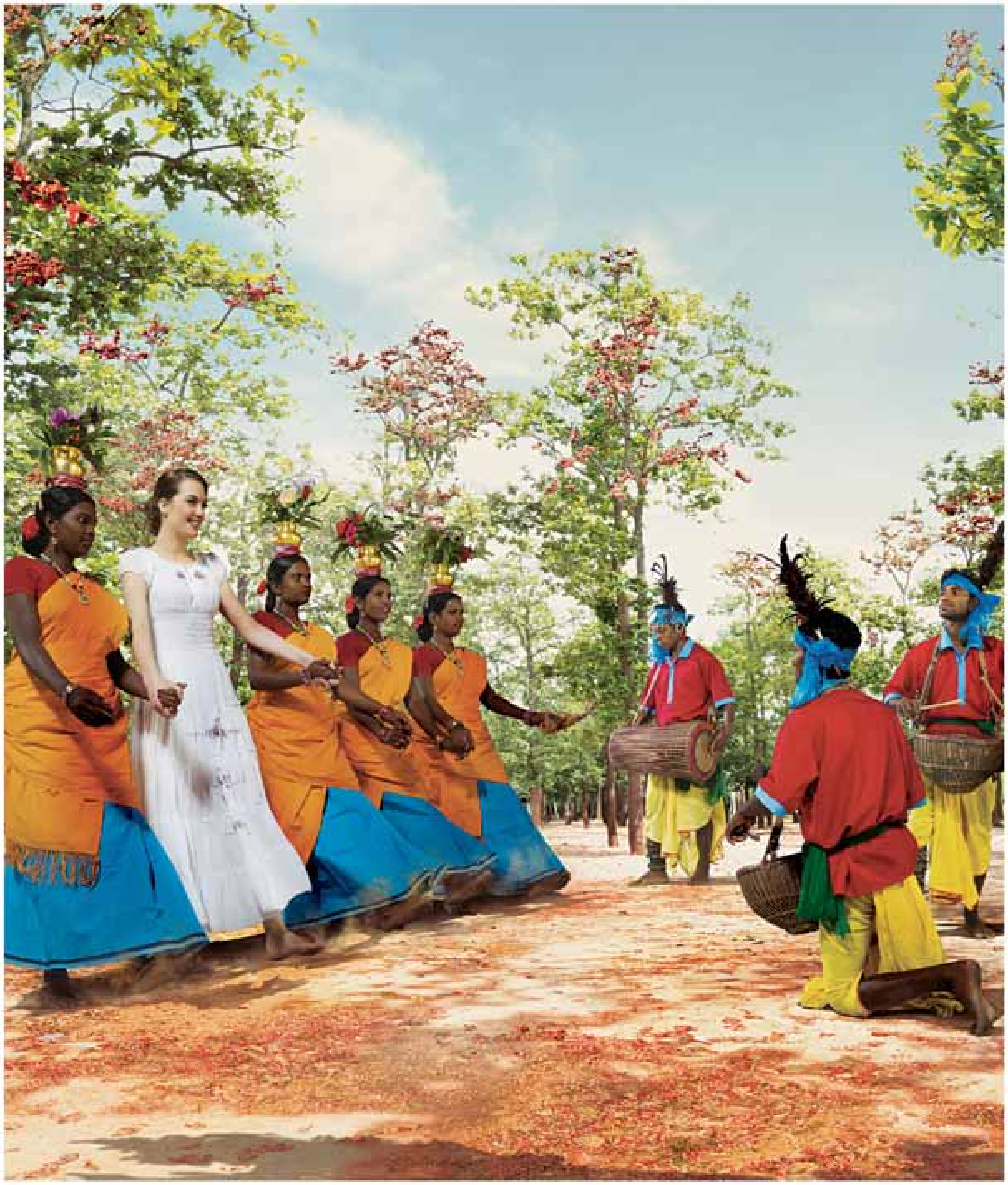

সব হতে আপন শান্তিনিকেতন

কোথাও অগভীর, কোথাও বা ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা। একটু এগোলেই খড়ের চালের ছোট ছোট কুটির। শান্তিনিকেতনের আশেপাশে এমনভাবেই ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা সাঁওতাল-পল্লী। মন মাতাল করা নাচের ছন্দ, জিভে জল আনা সাঁওতালী খাবার, আর ওঁদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিয়ে অতিথিপরায়ণ এই মানুষেরাও শান্তিনিকেতনের অতুলনীয় সম্পদ।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA

DEPARTMENT OF TOURISM,
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

চোখ-কানের দোষ

আজ্ঞে না, অনাহারে একজনেরও মৃত্যু হয়নি, বন্ধও হয়নি কোনও চা-বাগান। আমরা এতদিন ভুল দেখেছি, ভুল শুনেছি? কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য লাগছে না বুঝি? কিন্তু এমন কথা খোদ শ্রম মন্ত্রীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। তাহলে এতদিন ধরে পড়ে আসছি, শুনে আসছি, দেখে আসছি ডুয়ার্সের

চা-বাগানে অনাহারের কারণে অপুষ্টিতে মৃত্যুর কথা! নির্ঘাত ভুল প্রত্যক্ষ করেছি! যাই, গিয়ে হাসপাতালে চোখ-কান একবার পরীক্ষা করিয়ে আসি গে!

না বিনয়

এবার থেকে নাকি বর্ষাকালেও খুলে দেওয়া হচ্ছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সিংহ, থুড়ি 'ব্যাঘ্র' দুয়ার। কী মুশকিল বলুন তো! পর্যটকদের ঠেলায় নয় মাস বিভ্রান্ত হওয়ার পর বর্ষার তিন মাসও কি শান্তিতে থাকতে পারবে না ডুয়ার্সের পশুপাখি? তবে এ নিয়ে আগে থেকেই জলঘোলা করবেন না! কেননা বনমন্ত্রী বিনয়বাবু সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, পর্যটকরা বর্ষায় জঙ্গল সাফারিতে যেতে পারবে না। গুজব এই যে, বিনয়বাবুর কথায় পশুরা বেজায় খুশি হয়েছে এবং হাতিরা বলেছে, বিনয়কে জঙ্গলে একা পেলে আমরা গুঁতাব না।

চালকলরব

এরকম হেনস্থার কোনও মানে হয়? তাই 'হোক কলরব'। গল্পটা মন দিয়ে শুনুন তবে। স্থানীয় ট্রাক প্রতিদিন পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের পর আবার পণ্য খালি করে এপারে চলে আসছে। অথচ বাইরে থেকে পণ্য নিয়ে আসা ট্রাকগুলোকে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। তো, এমন ঘটনায় রাগ তো ফুঁসলে উঠবেই। অতএব হোক কলরব। সমস্ত ট্রাকচালক ট্রাক থেকে নেমে দেদার লেগে পড়েছেন পথ অবরোধে। চ্যাংড়াবান্ধায় ঘটেছে এসব। খুব কলরব এই নিয়ে।

রহস্য হে!

'গাধারাই জল ঘোলা করে খায়।' কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। এই তো সে দিন ফেসবুকের দেওয়ালে সেঁটে দিলেন একসময়কার ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা এবং বর্তমানের তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ। অবশ্যই তিনি গাধা বলতে কাদের বুঝিয়েছেন তা নির্ঘাত বোঝাই যাচ্ছে। আজ্ঞে না! বোঝাও যাচ্ছে না আবার! 'গাধা' কি জোটের রূপক, নাকি দলীয় কোনও গোষ্ঠীর? হায়েস্টলি সাসপিশাস!

সমস্যা

এ বলে, আমি আগে যাব তো ও বলে, না, আমি আগে। এবার ঠেলা সামলাও। তুমিই শেষমেশ সবার আগে পৌঁছে গেলে। কিন্তু যাওয়ার পর আর তো ফিরে আসার চান্স নেই! আসলে এই সমস্যা! ট্রাকের সঙ্গে বলা যেতে পারে রেষারেষি করতে গিয়েই পথদুর্ঘটনা বাধিয়ে ফেললেন অটোচালক এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু! ঘটনাস্থল, কোচবিহার-২ ব্লকের খোলটা এলাকা। ডুয়ার্সের অটো-ছোট ট্রাক-পিক আপ ভ্যান— এদের একটা অংশের প্রবণতা আছে রাস্তায় নেমে রেস খেলার। সাঁইসাঁই করে না ছুটলে এদের শান্তি নেই। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার অভাব নেই। কে বোঝাবে যে জোরে চালানোর গাড়িই নয় ওসব? সত্যিই সমস্যা বটে!

সূর্য নইলে ছাড়

আহঃ, কী শান্তির কথা! এবার থেকে নাকি টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে আর মাঝরাতে হোটেল ছেড়ে গাড়ি নিয়ে ছুটতে হবে না। পর্যটন শিল্পে অভিনবত্ব বাড়িয়ে দেবেন নাকি গৌতমবাবুই, তারই উদাহরণ শোনা যাচ্ছে এদিক-সেদিক। আগামী বছর পুজোর সময়ই নাকি পর্যটকদের জন্য আনা হবে নয়া অ্যাডভেঞ্চার। খোদ টাইগার হিলেই পর্যটকদের জন্য তৈরি হবে তাঁবু। আপাতত ৫০ জনের কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামো তৈরি হবে। তবে তাঁবুতে রাত কাটিয়ে ভোরের সূর্যোদয় দেখার সুযোগ পেতে পর্যটকদের কত গাঁটের কড়ি খরচ করতে হবে তা নাকি এখনও ঠিক হয়নি। পরিকল্পনা খাসা সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে সূর্যোদয় দেখাবার কন্ট্রোল সরকারের হাতে নেই বলে খচ্চা জলে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে কিছু 'ক্যাশব্যাক' চালু রাখা যেতেই পারে। মানে 'সূর্যোদয় দেখতে না পেলে ২৫ শতাংশ রিটার্ন'।

হায় সাধু

পুরুত থেকে সাধুসন্ন্যাসীর ভেক ধরে চরম ভণ্ড হয়ে ওঠার লোক বাড়ছে নাকি ডুয়ার্সে? জলপাইগুড়ি শহরের এক পুরুত পান্ডা ঝাড়ফুঁকের নামে এক কিশোরীর শ্লীলতাহানি করল। অবশ্য ব্যাটা আলবাত নিস্তার পায়নি। ওদিকে আবার মেটেলির এক আশ্রমে খোদ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী এদ্দিন চালিয়ে যাচ্ছিলেন কামসাধনা। প্রায় ২৬ জন কিশোর-কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়েছে উক্ত 'লোলুপাশ্রম'-এর ডেরা থেকে। মাঝে মাঝেই ঘটছে এসব। মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর!

বিয়ের কথা

ঘটনাস্থল চোপড়া থানার চতুরাগছ গ্রাম। সেখানে আবারও বট-পাকুড়ের মহা ধুমধাম

করে বিয়ে হয়ে গেল। সেই বিয়ের বাজেট শুনলে চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। ২৫ হাজার টাকা!!! আর বরযাত্রী ৫০০ জন!!! না মশাই, এটি মশকরা নয়। বট-পাকুড়ের বিয়ের মতো সত্যি। খাওয়ার মেনু খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি— উফ! জম্পেশ। এমনতর বিয়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে স্থানীয় যুবকদের উত্তর— 'বট-পাকুড় একসঙ্গে থাকলে তাদের বিয়ে দেওয়াই নিয়ম। কথাটা নাকি ধর্মেও লেখা আছে।' জানা গেল, পরের বিয়েতে নাকি কার্ডও ছাপা হবে।

যা-তা

গরর্র্র্র্! এসব কি শোনা যাচ্ছে অ্যাঁ! খোলা বাজারের চেয়েও নাকি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে রেশনে। আজ্ঞে হ্যাঁ। এমনই নজির গড়ে ফেলেছে বলে শোনা যাচ্ছে চ্যাংড়াবান্ধায়। আজকাল দেখছি চ্যাংড়াবান্ধায় চ্যাংড়ামি লেগেই আছে! স্থানীয় লোক কিন্তু এবার হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে— বলে রাখলুম, হ্যাঁ!

মঙ্গল হোক

মঙ্গলবাড়ির হাট মঙ্গলবারেই বসে। এদ্দিন অমঙ্গলের কিছু না ঘটলেও সে দিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল হাটের চালাঘরের মাথা। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্থানীয় এক শিক্ষিকা বলেছেন যে, এটা মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি চলে আসার ইমপ্যাক্ট।

ময়না গাড়ি

আচ্ছা! একটা আস্ত স্ট্যান্ড থাকা সত্ত্বেও ময়নাগুড়িতে প্রাইভেট বাসগুলো বাজারের সামনে অমন রাস্তা আটকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? যাত্রীর সুবিধার্থে একটা একটা করে এসে অল্প একটু দাঁড়ালেই পারে। কিন্তু তা-ই বলে ওয়ান ওয়ের একটা 'ওয়ে' দখল করে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে কী? স্ট্যান্ড থাকলেও বাসওয়ালাদের সেখানে না গিয়ে রাস্তা দখল করে রাখার একটা প্রবণতা ডুয়ার্সে আছে। কিন্তু দাদা! জনপদে পথ হল পথিকের। এবার হয় বাসগুলোকে সহবত শেখান, নইলে টাউনের নাম পালটে করে দিন ময়না গাড়ি। পাবলিক কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভিসুভিয়াস হয়ে আছে!

চাল মাস্টার

কালিয়াগঞ্জের দরিয়ামান পুর বিএসসি বিদ্যালয়ের মিডডে মিলের চালের গুদামের চাবি এক রহস্যময় বস্তু। সে চাবি কার কাছে

থাকে কেউ জানে না। তবে গুদামের থেকে চালের বস্তার নাকি পাখা গজায়, আর উড়ে উড়ে চলে যায় কোথাও! সে দিন হয়েছে কী, স্কুলের এক শিক্ষক নাকি চাল সরাচ্ছিলেন গুদাম থেকে। কারা জানি তা দেখতে পেয়ে মোবাইলে ভিডিয়ো তুলে রেখেছিল। কিন্তু

অন্ধকারে শুটিং ভাল হয়নি, তাই চোর চিনতে পারা যাচ্ছে না। শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলেও তদন্ত কমিটি বসিয়ে কিছু করতে পারেনি স্কুল। তা সেই শিক্ষক নাকি একা নন, চাল চালানে তাঁর কিছু কলিগ আর খিচুড়ি পাকানোরও কেউ কেউ আছেন! কী রহস্য, কী রহস্য! দিদি না হয় ডিএ কম দিচ্ছেন, তা-ই বলে চাল সরাবি? তুই না 'মাস্টর'!

টুকরাণু

ডুয়ার্সে পরিযায়ী পাখিরা বিপন্ন বলে ফের হইচই। অনেক স্কুলে পৌঁছাতে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষক জলকাদা ডিঙিয়ে 'হোলি হ্যায়' বলে ফেলছে। ময়নাগুড়িতে বাড়ির ভিতর কিং কোবরা এবং তার 'উজ্জ্বল উদ্ধার'। রাতভর বৃষ্টিতে কালচিনি ব্লকে গুরুত্বপূর্ণ সেতু মচাৎ! জলের গুঁতোয় সেবকের তিস্তার উপর রেল ব্রিজের একটা থাম গুরুতর আহত। বানারহাটে একটা কচ্ছপ পাড়াতে, সম্ভবত বাড়ি ভাড়ার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং তাকে যথাস্থানে ফেরত পাঠানো গিয়েছে। বালুরঘাটে ঝগড়া, উত্তেজনায় শাশুড়ির নাকে বেজায় কামড়ে দিয়েছে বউমা। জলপাইগুড়িতে ফের 'অজানা' জ্বর।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 5,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

ধান উৎপাদনে পিছিয়েই থাকবে তরাই-ডুয়ার্স ?

ডুয়ার্স বলতে যদি বর্তমান জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের সঙ্গে কোচবিহার জেলাকে জুড়ে দিয়ে দার্জিলিঙের খানিকটা ঢুকিয়ে দিই, তবে এই গন্ডাখানেক জেলাকে ‘চালবাজ’ বলা অনুচিত হবে। অবশ্যি চাল বলতে ধান থেকে উৎপন্ন সেই শস্যটির কথাই বলছি, যা জলে সেদ্ধ করে মাছের ঝোল দিয়ে খেতে বাঙালি চিরকাল পছন্দ করে আসছে। এই জেলাচতুষ্টয়কে চালবাজ বলতে না পারার কারণ আর কিছু নয়। ধান ফলানোর ব্যাপারে এদের স্থান রাজ্যের ধান্য স্কুলের পিছনের বেঞ্চিতে। এমন নয় যে জেলাগুলিতে ভাত খাওয়ার চল নেই। ডুয়ার্সে ভাতই প্রধান খাদ্য।

ডুয়ার্সে কি ধান হওয়ার পরিবেশ নেই? এই অঞ্চলে মাটির বড় অংশ তিস্তা-মহানন্দা-তোর্সার পলি থেকে উৎপন্ন মাটি। এই মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশ ভাল, জৈব পদার্থও যথেষ্ট, কিন্তু ঘাটতি ফসফেটের। জলপাইগুড়ি আর আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর অংশ এখনও অরণ্যশাসিত এলাকা, কিন্তু কোচবিহারে অরণ্যের পরিমাণ তুলনায় অনেকটা কম। সুতরাং পলিমাটির গুণাগুণের তফাত থাকবে। কিন্তু তফাত থাকলেও ডুয়ার্সের পলিমাটি ধান চাষের পক্ষে প্রতিকূল— এ কথা ভাবার কোনও কারণ নেই। আর বৃষ্টির প্রসঙ্গ এলে বলতে হয় যে, ডুয়ার্সে ২৫০ থেকে ৩৫০ সেমি জল ঝরে ফি-বছর।

উক্ত আবহাওয়ায় ধান মন্দ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ‘রাইস ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল’-এর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৪-২০০৭ সালে চাল উৎপাদনে প্রথম হয়েছিল বীরভূম জেলা, হেক্টরপিছু ৩০৮৫ কেজি। আর লাস্ট বয় ছিল জলপাইগুড়ি, মাত্র ১৬৬৩ কেজি! মোটামুটিভাবে বিবেচনা করা হয় যে,

কোচবিহার জেলা ধান চাষে 'লো-মিডিয়াম প্রোডাক্টিভিটি' এবং জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার-দার্জিলিং 'লো প্রোডাক্টিভিটি' অঞ্চলের সার্টিফিকেট পেতে পারে।

রাজ্যে ধান চাষের ক্ষেত্রে কৃষকদের পয়লা পছন্দের ধান হল 'আমন'। অধিকাংশ জেলাতেই আউশ-আমন-বোরো— এই ধান্যত্রয়ীর মধ্যে আউশের উৎপাদন বাকি দু'টির তুলনায় ঢের বেশি। কম পছন্দের ধান হল আউশ। ডুয়ার্সের জেলাগুলিও এর খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। ২০০৪ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় ১৮৩, কোচবিহারে ২১৬.৫ এবং দার্জিলিঙে ২৮.৯ মিলিয়ন টন আমন ধানের চাষ হয়েছিল, যেখানে আউশের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৭.৩, ৪.৯ এবং ১৪.০ মিলিয়ন টন। লক্ষণীয় যে, সে বছর জলপাইগুড়িতে বোরো ধানের চাষ হয়েছিল আউশের চাইতে কম। বোরো ফলেছিল আউশের পরিমাণের অর্ধেকেরও কম। ২০ মিলিয়ন টনের একটু বেশি। কোচবিহারে অবশ্য আউশ-বোরোর তফাত ছিল ৪ মিলিয়ন টনের মতো।

বোরো ধানের চাষ মূলত সেচনির্ভর। ডুয়ার্সে সেচব্যবস্থা আদৌ উন্নত নয় এবং সেচের জন্য জলের একটা বড় অংশ তোলা হয় মাটির নীচ থেকে। অন্য দিকে, জমিতে পরপর দু'বার ধান চাষের মাঝে অন্য কোনও কিছু চাষ করে নিতে হবে। বছরে তিনবার ফসল ফলানোর ছকটা জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারে মোটামুটি এইরকম— (১) পাট-ধান-আলু (২) পাট-ধান-সবজি (৩) সবজি-ধান-আলু। কোচবিহারে এর অতিরিক্ত 'পাট-ধান-তামাক' কিংবা 'সবজি-ধান-তামাক'— এই ধরনের চাষবিন্যাস পাওয়া যায়। মুষ্টিমেয় কিছু চাষি পাট-ধান-গম করে থাকেন। কেউ কেউ দু'বার ধান চাষের মাঝে জমি ফেলে রাখেন উর্বরতা বাড়ানোর জন্য।

ডুয়ার্সের অন্যতম অর্থকরী ফসল হল পাট। বর্ষায় আমন ধানের চাষ শুরু করার আগে সে ধানের বীজতলা আর চারা তৈরি করতে হয়। পাট কাটার পর জমি ফাঁকা হলে আমনের চারা রোপণ করেন ডুয়ার্সের চাষিরা। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ এই ধান সোনালি হয়ে শরতের আগমন ঘোষণা করতে থাকে। আমনের চারা রোপণের জন্য জুলাই মাসে বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। খেতে বৃষ্টির জল ধরে রেখে আমনের চাপা রোপণ করা নিয়ম। ডুয়ার্সে বৃষ্টির পরিমাণ আগের তুলনায় অনিয়মিত। জুলাই মাসে জলপাইগুড়ি-আলিপুর জেলায় ৭০-৮০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়। গত বছর উক্ত মাসে সেই পরিমাণ ছিল মাত্র ২০ সেন্টিমিটার। এর ফলে অনেক জমিতে ধান বোনা যায়নি। দুই জেলার প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর জমির অন্তত চতুর্থাংশ অপেক্ষা করছিল আরও বৃষ্টির জন্য। মনে রাখতে হবে যে, এই দুই জেলার মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম। আবার, ডুয়ার্সে সেপ্টেম্বরেও বন্যা হতে পারে। তেমন ঘটলে আমন ধান নষ্ট হবে। এটাই ভাগ্য।

ডুয়ার্সে কি ধান হওয়ার পরিবেশ নেই? এই অঞ্চলে মাটির বড় অংশ তিস্তা-মহানন্দা-তোর্সার পলি থেকে উৎপন্ন মাটি। এই মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশ ভাল, জৈব পদার্থও যথেষ্ট, কিন্তু ঘাটতি ফসফেটের। সুতরাং পলিমাটির গুণাগুণের তফাত থাকবে। কিন্তু তফাত থাকলেও ডুয়ার্সের পলিমাটি ধান চাষের পক্ষে প্রতিকূল— এ কথা ভাবার কোনও কারণ নেই।

আমনের চারা রোপণের সময় প্রচুর লোক দরকার হয়। ডুয়ার্সে এই সময় স্কুলে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি কমে যায় গ্রামাঞ্চলে। শহরে অন্য কাজের জন্য শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। বৃষ্টি না হলে এই চারা রোপণকারীদের অর্থনীতিতে আঘাত লাগে। গত বছর দক্ষিণ কোচবিহারের অনেক যুবক বৃষ্টির অভাবে রোপণের কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেছিলেন অনন্তদেব অধিকারী।

বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া— এদের তুলনায় ধান উৎপাদনে ডুয়ার্সের জেলাগুলি তুচ্ছ। জলপাইগুড়ি আর আলিপুরদুয়ার জেলাদ্বয়ের ভূমির বড় অংশ জঙ্গল আর চা-বাগান দখল করে আছে। মোট জমির গড়পড়তা ৯-১০ শতাংশে ধান চাষ হয়। এটা উক্ত তিনটি জেলা বা 'হাই প্রোডাক্টিভ' ধান্যাঞ্চলে গড়ে ৬০ শতাংশ। এদিকে পাট-তামাকের দর চড়লে চাষির মুখে হাসি ফোটে। ধান চাষ অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। ডুয়ার্সে ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যাই বেশি। এঁরা ধান চাষ করেন মূলত নিজেদের ব্যবহারের জন্য। বোরো ধানের বদলে আলু চাষে লাভের সম্ভাবনা বেশি। না হলে শীতকালীন সবজি চাষ। বহু যুগ পর্যন্ত ডুয়ার্সে জনঘনত্ব অতি কম থাকায় কমবেশি বৃষ্টিতেও সমস্যায় পড়েনি। খরা বা দুর্ভিক্ষ ডুয়ার্সের ইতিহাসে প্রায় নেই। তিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তরের ছাপ ডুয়ার্সে প্রায় পড়েনি বললেই চলে।

ডুয়ার্সের ধান নিয়ে গল্প করতে গিয়ে 'কালো নুনিয়া'র কথা বলব না তা হয় না। এ

হল সেই চাল, যার ভাত জুঁই ফুলের মতো ধবধবে আর ম ম করে সুগন্ধে। একে আদর করে বলা হয় 'প্রিন্স অব রাইস'। আরেকটা নাম 'কালো জিরা'। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর, ধূপগুড়ি এবং রাজগঞ্জ ব্লকের মোট ১৭ হেক্টর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে, বোরো মরশুমে, এই ধানের চাষ পুনরায় শুরু হয়েছিল সরকারি উদ্যোগে। সেটা কেল্লা ফতে করার পর মাথাভাঙায় পুরোপুরি জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে আশানুরূপ ভাল কালো নুনিয়া ফলানো গিয়েছে। এবার নাগরাকাটায় পরীক্ষা করে দেখা হবে। অর্থাৎ, আগামীতে ডুয়ার্সে কালো নুনিয়ার চাষ আবার বাণিজ্যিকভাবেই শুরু হবে বলে ভাতপ্রেমীদের আশা। এই চালের কবোষ্ণ ভাত ঘি দিয়ে মেখে বেগুন ভাজা দিয়ে খাওয়ার মজা থেকে বহুদিন বঞ্চিত ডুয়ার্সবাসীর জন্য সুখবর বটে! অবশ্য কালিম্পং কৃষি গবেষণাকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছিল যে, কালো নুনিয়ার বিকল্প হিসেবে তাঁরা 'পুষা' নামক একটি চালকে ডুয়ার্সের ভবিষ্যৎ হিসেবে ভাবছেন। কালো নুনিয়া ফলতে লাগে মোট পাঁচ মাস। পুষা চার মাসে ফলে। ফলনের পরিমাণ কালো নুনিয়ার দ্বিগুণ। ১৪ মনের মতো প্রতি বিঘায়।

ডুয়ার্সের ধানের গন্ধে সব চাইতে অবহেলিত চরিত্র হল কৃষক। সরকার ন্যায্য মূল্যে ধান কেনার চেষ্টা করছে। কিন্তু কৃষককে দেওয়া চেক বাউন্স করার কথা শোনা গিয়েছে। ধান যে কেনা হবে তা না জানিয়েই কিনতে এসেছিলেন সরকারি লোকজন। ফড়েদের রাজত্বই এখানে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ডুয়ার্সের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ধান হবে। নবান্নও হবে। কিন্তু একটু পড়াশোনা করে ফেলা নবপ্রজন্ম ধান চাষের জন্য আগামীতে খুব একটা টান যে অনুভব করবে না, তা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। এখানকার আদি বাসিন্দা বা রাজবংশীরা কৃষিকর্মে খুব যে পটু ছিলেন এমন নয়। কিন্তু এমনিতেই যা ফলত, তাতে চাহিদা মিটে যেত। গত শতকের আটের দশকের গোড়া থেকে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এই ভূখণ্ডে এসেছে। ডুয়ার্সের ধানি জমির অনেকটা অংশ এখন তাদের হাতে। এরা কৃষিতে দক্ষ। কিন্তু আগামীতে ধান চাষের দিকে কতটা তারা ঝুঁকবে, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। ডুয়ার্সে বিকল্প চাষের পরিমাণ ধীরে হলেও বাড়ছে। স্ট্রবেরি হচ্ছে ডুয়ার্সের মাটিতে এবং বেশ ভাল মানের।

তাই ধান চাষের বঙ্গ দরবারে ডুয়ার্স মনে হয় লাস্ট বেঞ্চেই থেকে যাবে।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
ছবি অমিতেশ চন্দ

ধান উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে তবু চাষির মন পাট ও আলুতেই

ডুয়ার্সে 'কত ধানে কত চাল'-এর হিসেবের সাম্প্রতিক রূপটা জানতে গিয়ে দেখা গেল যে সরকারি ওয়েবসাইটে বর্তমান সরকারের প্রথম পাঁচ বছরের কোনও তথ্য মেলে না। জেলায় জেলায় কৃষি দপ্তরে হানা দিয়ে গত পাঁচ বছরে ধান উৎপাদনের তথ্য যোগাড় করা ধৈর্য সাপেক্ষ। ডুয়ার্সে ধান উৎপাদনে কোচবিহার জেলা যথেষ্ট এগিয়ে। জেলা কৃষি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা এ কে এম মিজানুর আহসান যা তথ্য দিলেন তা হল গত পাঁচ বছরে জেলায় ধান উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১১-১২ সালে মোট উৎপাদন ছিল ৬০০৭০০ টন, সেখানে ২০১৫-১৬ সালে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৮০০০০ টন। যা থেকে উৎপাদিত চালের পরিমাণ ৬৬০০০০ টন। যা জেলার মোট চাহিদার থেকে বেশি। আমন ধানের চাষ হয় ২,১০,০০০ হেক্টর জমিতে যা ক্রমবর্ধমান। সেক্ষেত্রে আউস ও বোরোর চাষ তুলনায় অনেক কম, যথাক্রমে ৪০,০০০ ও ৪৫,০০০ হেক্টর জমিতে।

জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি দপ্তরের ডিডিএ সুজিৎ পাল জানালেন যে, ডুয়ার্সের জেলাগুলিতে বোরো ধানের উৎপাদন বিগত বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান এবং আগের তুলনায় তো বটেই। ২০১৩-১৪'তে জলপাইগুড়ি জেলায় ২১,২৬২ হেক্টর জমিতে বোরো ফলেছে। সেটা ২০১৫-১৬'তে দাঁড়াচ্ছে ২৩,৫০০ হেক্টর। এর কারণ তিস্তা সেচ প্রকল্পের জল মালবাজার ব্লকের চাষিরা পাচ্ছেন। অন্যদিকে ২০১৫-১৬ তে এই জেলায় আউশ, আমন, বোরো ফলনের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০৫৮৭, ৪৪৬৬৭২, ১২৩৩৭৫ মেট্রিক টন।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি কেবল নয়, রাজ্যজুড়ে ধান বেশি ফলছে সরকারি নীতির কারণে। উন্নত মানের বীজ চাষিদের হাতে পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। ডুয়ার্সের চাষিরা দেশি ধান ছেড়ে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে শাসক দলের কৃষক সভার কর্তা দুলাল দেবনাথ জানালেন যে, জমি না চষে চাষ করার প্রযুক্তি ডুয়ার্সে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করাও শুরু হয়েছে। 'বর্তমান সরকার তার কৃষিনীতিগুলি ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারছে বলেই ধান

এবং অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বাড়ছে ডুয়ার্সে।

কিন্তু ইদানিং বোরো চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও অর্থকরী কারণে পাট ও আলু চাষের প্রতি ডুয়ার্সের চাষিদের আগ্রহ বেশি বলেই জানালেন সবাই। সুজিৎবাবুর ব্যাখ্যায় 'আলু চাষের ব্যাপারটা কৃষকের কাছে প্রেস্টিজিয়াস ইস্যু। আলু চাষির সামাজিক পরিচিতি বেশি। এ চাষে ঝুঁকি থাকলেও লাভও যথেষ্ট হয়। তুলনায় ধান চাষে অত টাকা কোথায়?'

'আমরা স্থানীয় কৃষকদের নানাবিধ চাষে উৎসাহ দিচ্ছি। জৈব সার প্রয়োগ করে চিরাচরিত প্রথায় চাষেও উদ্বুদ্ধ করছি তাঁদের। এতে চাষের খরচ কমবে।' বলেছেন সুজিৎ পাল, প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। ডুয়ার্সের চাষযোগ্য জমিকে দুটি চাষের মাঝে ফেলে রাখার প্রবণতাও কমিয়ে আনা যাচ্ছে। এটা ঠিক যে রাজ্যে ধান উৎপাদনে ডুয়ার্সের জেলাগুলি পেছনের দিকে। কিন্তু তার কারণ ভিন্ন। কিন্তু উৎপাদনের বিচারে ডুয়ার্সের ধান চাষকে বিশ্লেষণ করলে নেতিবাচক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। বরং এখানকার নিজস্ব 'কালো নুনিয়া'র পেটেন্ট আদায় করার ব্যবস্থা শেষের দিকে। এটা ডুয়ার্সের ধান উৎপাদনের অত্যন্ত ইতিবাচক একটা দিক হতে চলেছে।

ডুয়ার্সের ধান বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে পা রেখে মনে হয়েছে যে রাজ্যে ফসল উৎপাদনের জেলাওয়ারি তথ্য সরকারি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সহজলভ্য করার দায়িত্ব পালনে সরকার অজ্ঞাত কারণে 'আপটু ডেট' নয়। রাজ্যব্যাপী ফসল উৎপাদনে জোয়ার আসার দাবী সরকার করছেন। কিন্তু সে দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার দায়ও সরকারের। এ ক্ষেত্রে সরকারের প্রথম পাঁচ বছরের কৃষি পরিসংখ্যান সাধারণ, জিজ্ঞাসু মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে 'ই গভর্নেন্স' ডাহা ফেল!

শু. চ. (সংযোজন পিনাকী মুখোপাধ্যায়)

অগত্যা আবার গৌতম! কিন্তু পর্যটনে কাজ করবার সুযোগ পাবেন কতটুকু?

শিলিগুড়ির জনগণ বলছে, এ তো সেই ঘুরিয়ে নাক ধরার মতো অবস্থা হল। দার্জিলিং জেলায় পরপর বিপর্যয়ের ফলে একদা যাঁর চাকরি গেল, তাঁকেই পুনর্বহাল করতে হল জেলার সভাপতির পদে। কারণ একটাই, গৌতম ছাড়া গতি নাই! অথচ মাসকয়েক আগেও গৌতমবাবুর অবস্থা দলের মধ্যে ছিল বেশ শোচনীয়। ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়ার দাপটে তখন চলছিল তৃণমূল। শোনা যাচ্ছিল, খোদ মন্ত্রীকেও ধমকাচ্ছিলেন বাইচুং। আর মজা দেখছিল বাকি সবাই, অর্থাৎ শিলিগুড়ি নগরীর তৃণমূলিরা, যারা একে অপরকে টেনে নামানোয় কাঁকড়াকেও লজ্জায় ফেলে দিতে পারে, যারা মানুষের রায়ে জিতেও পৌরসভা ধরে রাখতে পারেনি, বারবার হেরেও যাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অনুশোচনা হয়নি। দলের নেত্রীও এই বিশেষ প্রজাতির তৃণমূলিদের চিনে উঠতে পারলেন না আজ অবধি। এরকমই দীর্ঘ আক্ষেপ শোনা গেল শহরের জনৈক বিশিষ্ট নাগরিকের মনে, যিনি তৃণমূলিদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে গত পৌরসভা নির্বাচনে নিজের ওয়ার্ডে সিপিএম প্রর্থীকেই ভোট দিয়েছিলেন।

খোদ শিলিগুড়ি শহরেই গৌতম দেবকে নিয়ে শাসক ও বিরোধী দলে একাধিক 'কিন্তু' আছে। যেমন বিরোধী শিবিরের লোকেরাই বলে, শিলিগুড়ির বাসিন্দা হলেও গৌতমবাবু এখানকার পছন্দের লোক হতে পারেননি কোনও দিনই। আর সেটা উনি বিলক্ষণ জানেন বা বোঝেন বলেই এগারোর নির্বাচনে শিলিগুড়ি থেকে নয়, দাঁড়িয়েছিলেন পাশের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে। সেই সঙ্গে অশোক ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন, সেটাও অবশ্য উনি জানতেন। যদিও বহু মানুষ এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁদের কথায়, এটা শিলিগুড়িতে এখন 'ওপেন সিক্রেট' যে, গৌতম দেব, অশোক ভট্টাচার্য ও শংকর মালাকার— এই ত্রয়ীর নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া অত্যন্ত মজবুত। এগারোর বিধানসভায় রুদ্রনাথের মতো প্রার্থীর হাতে পরাজয় অশোক ভট্টাচার্য তো বটেই, গৌতম

দেবও নাকি আশা করেননি, পরবর্তীকালে তাই সুযোগ বুঝে রুদ্রনাথকে 'সাইড' করে দেওয়া হয়। যদিও বামপন্থী শিলিগুড়িবাসী এসব তত্ত্ব মানতে নারাজ, ভোটের আগে এই তত্ত্ব অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ত্রয়ীর নিজেদের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের বহর দেখে।

যে যা-ই বলুক, তৃণমূল সমর্থকরা একটা সত্য অকপটে স্বীকার করছেন— দলে গৌতম ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। গৌতমের গ্রহণযোগ্যতা দলের সব মহলে কতখানি তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একটি যুক্তি সর্বস্তরে গ্রহণীয়— অশোক ভট্টাচার্যকে টক্কর দিতে হলে গৌতম ছাড়া গতি নেই। আগামী পৌরসভা নির্বাচনে অশোককে ঠেকাতে হলে সংগঠনের ছন্নছাড়া চেহারা ফেরানো অরূপ বিশ্বাসের কম্ম নয়— পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে দলের নিচুতলার কর্মীরা। তাহলে গৌতমকে তখন সরানো কি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল? এক কথায় উত্তর দিচ্ছেন শিলিগুড়ির রাজনীতিসচেতন মানুষ, অবশ্যই হ্যাঁ। কারণটাও তাঁরা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করছেন— এক তো প্রথমবারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হওয়ায় তাঁকে শুরু করতে হয়েছিল শূন্য থেকে। তার উপর এসজেডিএ, এনবিএসটিসি ইত্যাদি বেশ কিছু পদের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ের উপর থাকায় সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করার মতো সময় ভীষণ কমে গিয়েছিল গৌতমবাবুর। ক্ষমতা যে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল তা নয়, বরং বলা যায়, সময়ের অভাবে তিনিই ক্রমাগত অসহায় হয়ে পড়ছিলেন।

আজকের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর উপর সেই চাপ নেই, অন্যান্য দায়িত্বও বিভিন্ন নেতার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন নেত্রী, কিন্তু সে সময় তিনি গৌতম দেব ছাড়া আর কাউকেই খুঁজে পাননি কেন, সেই প্রশ্ন তুলছেন দলের অনেক ব্লক স্তরের নেতা। তাঁদের ব্যাখ্যা হল, সব ক্ষমতা এক হাতে থাকায় আরও ক্ষতি হয়েছে। এক বিশেষ শ্রেণির সুযোগসন্ধানী মন্ত্রীর আশপাশে ঘিরে থাকত, ফলে বাকিরা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল। তারা যোগাযোগ রাখছিল কলকাতায় নেত্রীর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্লক নেতা বললেন, আর এতে সবরকম ইন্ধন জোগাচ্ছিল শিলিগুড়ির এক শ্রেণির ব্যবসায়ী, যারা অন্যান্যদের জন্য মন্ত্রীর কাছে ঘেঁষতে পারত না, কিছু ঠিকাদার, যাদের গৌতমবাবু বাড়ির সিঁড়িতে উঠতে দিতেন না। পৌরসভা ও তারপর মহকুমা পরিষদে খারাপ ফল হওয়ায় এদের সুবিধে হয়ে গেল। ঠিকাদারদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা পিটছেন— এরকম একটা প্রচার সুচারুভাবে বাজারে ছড়িয়ে পড়ল, এবং তা পৌঁছে গেল নেতৃত্বের কানেও। গৌতম সভাপতির পদ

মুখ্যমন্ত্রীর 'চ্যালেঞ্জ' প্রকল্প গাজলডোবা পর্যটন হাব সফল করার জন্য স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ কি দেওয়া হবে নতুন পর্যটন মন্ত্রীকে?

হারালেন, এনবিএসটিসি-র দায়িত্ব গেল, তার উপর বড়সড় সার্জারির জন্য দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার সুযোগ নিল সেই চক্র। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে বিশাল মিছিল এবং ভোটযুদ্ধে জয় সম্ভব করল তাঁর নিজের কেন্দ্রের বলিষ্ঠ সংগঠন, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সবাইকে অবাক করে দিয়ে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন দপ্তর তাঁর হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। বলতে বলতে হতাশায় বুজে এল সেই নেতার গলা।

গৌতম দেব কাজ করেননি— এ কথা তাঁর অতি বড় শত্রুও বলতে পারবেন না। স্বভাবতই শিলিগুড়ির হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ায় রীতিমতো আপশোস করছেন। তাঁদের কারও কারও বক্তব্য, এমনিতেই হেরে আছি। উন্নয়নের সুযোগই যদি না থাকে, তবে হারা সিট জেতা কঠিন। নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থেই হোক বা শিলিগুড়ির সেন্টিমেন্টেই হোক, তাঁরা অনেকেই আবার গৌতমের জেলা সভাপতির পদাসীন হওয়াকে মনে মনে স্বাগত জানিয়েছেন, সম্ভবত এই অঙ্কেই নেত্রী আবার গৌতমকে বসিয়েছেন। দলীয় কর্মীদের ব্যাখ্যা, তবে পাহাড়ের সংগঠনটা পাহাড়ি কারও হাতে ছাড়লে দলের লাভ।

পর্যটনে কাজ করবার কতটুকু সুযোগ পাবেন গৌতম?

আলিপুরদুয়ারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালনের জন্য মঞ্চে প্রদীপ জ্বালালেন উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। বক্তৃতায় উন্নয়ন মন্ত্রী বললেন, পর্যটনকেই পাখির চোখ করে দেখতে চান তিনি ও তাঁর দপ্তর। সৌরভ বললেন, পর্যটনে সেরা হিসেবে তুলে ধরতে চান আলিপুরদুয়ারকে। উত্তেজনায় উপস্থিত দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠলেন। কেবল গুটিকয়েক নিন্দুক ধরনের মানুষ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, সবাই পর্যটন উন্নয়নের এত কথা বলছেন, কিন্তু রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীর তো এই অনুষ্ঠানে থাকা উচিত ছিল, তিনি কোথায়? সত্যি কথা বলতে, পর্যটন মন্ত্রীর সেই উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুলেছিল অনেকের মনেই, আদৌ কি পর্যটন উন্নয়নের কাজ গৌতম দেব স্বাধীনভাবে করতে পারবেন? কারণ গত পাঁচ বছরের শাসনকাল কিন্তু তা বলে না। আমলারা যে যা-ই বলুন, রচপাল থেকে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ, তারপর ব্রাত্য বসু— প্রত্যেকেরই একই হাল। ফিতে কাটা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম প্রিয় দপ্তর পুরোটা সামলেছেন তাঁর

কয়েকদিন আগে লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে যারা গৌতম দেবের তীব্র বিরোধিতা করেছে, মন্ত্রীসভা গঠনের পর তাদের গলাতেও হতাশার সুর, গৌতম দেবের অবস্থা বিগত পর্যটন মন্ত্রীদের মতোই হবে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে মন্ত্রীসভায় প্রতিনিধিত্ব করার মতো কেউই থাকল না। অথচ ভৌগোলিক কারণে শিলিগুড়ির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

পছন্দের আমলা একাদশের অন্যতম বর্ধন সাহেব। এবারও প্রশ্নটা তাই উঠছে সব মহলেই— দপ্তর হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, গৌতম দেবকে দায়িত্ব দেওয়াটাও কাগজে-কলমে তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু আগের দৃষ্টান্ত মেনে চললে একটা প্রশ্নই উঠে আসে। দুঁদে আমলারা গৌতমকে কতটা শুনবেন? গাজোলডোবাকে দাঁড় করাবার জন্য গৌতম কি 'অবাধ ক্ষমতা' পাবেন? ডুয়ার্সের বা পশ্চিমবঙ্গের মাস্টারপ্ল্যান বানাবার 'স্বাধীনতা' কি তাঁকে দেওয়া হবে? ওদিকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীও উত্তরের পর্যটনকে শিল্পে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সৌরভ তাঁর আলিপুরদুয়ারকে 'সেরা' বানাবার মাস্টারপ্ল্যান ছকে ফেলেছেন। বন উন্নয়ন নিগমও উদয়নের হাত ধরে পর্যটন পরিষেবাকে উন্নত করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এঁদের কেউই এখনও পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসেননি।

দলের অন্য নেতাদের ব্যাখ্যাও সেই একই। আসলে সবাই দেখতে চাইছেন, আদৌ কতটা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন গৌতম, সেই হিসেবেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের অঙ্ক ঠিক করবেন। সেই জন্যই সম্ভবত তাঁর দপ্তরে এখনও সেভাবে ভিড় জমেনি বলে মতামত জনৈক গৌতম-অনুগামীর। তাঁরই কথায়, দাদার মনমেজাজ খুব একটা ভাল নেই, কাজ কতটুকু করতে পারবেন, সন্দেহ রয়েছে তাঁর নিজেরও।

শিলিগুড়ির ডান-বাম মহল সবারই এখন একই মনের অবস্থা। কয়েকদিন আগে লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে যারা গৌতম দেবের তীব্র বিরোধিতা করেছে, মন্ত্রীসভা গঠনের পর তাদের গলাতেও হতাশার সুর, গৌতম দেবের অবস্থা বিগত পর্যটন মন্ত্রীদের মতোই হবে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে মন্ত্রীসভায় প্রতিনিধিত্ব করার মতো কেউই থাকল না। অথচ ভৌগোলিক কারণে শিলিগুড়ির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। আর শিলিগুড়ির উপর চাপ কমাতে হলে জলপাইগুড়ির উন্নয়ন ছাড়া গতি নেই। পরিষেবার সুযোগ না পেলে রাজনৈতিক দৌড়ে আরও পিছিয়ে পড়বে এই দুই জেলার তৃণমূল সংগঠন। অদূর ভবিষ্যতে তা টের পাওয়া যাবে বিলক্ষণ, উত্তরবঙ্গের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহলের এই মুহূর্তে সেইরকমই ধারণা।

আমলাদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা গৌতমবাবুর রয়েছে। পর্যটন সচিবও নিজের কাজকর্ম নিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গুড বুকে রয়েছেন। উন্নয়নের প্রশ্নে মন্ত্রী-সচিব সংঘাত হওয়ার কথা নয়। কারণ নানা প্রকল্পের সূচনায় মন্ত্রী এবং রূপায়ণে সচিব মহাশয়ের অগ্রাধিকার থাকলে কাজ এগবেই। এ ব্যাপারে আশাবাদী পর্যটন দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু তাঁরাই আবার শঙ্কিত, সমস্যা হতে পারে অন্য ক্ষেত্রে। এক, পর্যটন মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় বিষয়, এতদিন তিনিই ভাবনার দায়িত্বটুকু পালন করে এসেছেন। পর্যটন মন্ত্রীর কোনও ভাবনা বা সিদ্ধান্তকে খারিজ করে সচিবের সিদ্ধান্তকে বেশি গুরুত্ব দিলে 'মর্যাদার লড়াই' বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দুই, পর্যটন উন্নয়নে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে এই সংঘাত লেগে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মন্ত্রী রাজ্যের পর্যটন উন্নয়নে কতটা সুযোগ পান, সেটাই দেখার। ব্যর্থতার দায়ভার কাঁধে নিয়ে অপসৃত নেতা কতটা ফর্মে ফিরতে পারেন তা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে উত্তরের মানুষ।

উত্তরায়ণ সমাজদার

ফালাকাটা ও ময়নাগুড়িকে পৌরসভা ঘোষণায় এত গড়িমসি কেন?

সবকিছুই প্রায় ঠিকঠাক। নীতিগত অবস্থান, পরিকাঠামো, ভৌগোলিক প্রেক্ষিত, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের অভিমুখ আরও ত্বরান্বিত করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য এবং সর্বোপরি সরকারের শীর্ষনেতৃত্বের সদিচ্ছা। তবুও দিন কেটে যায়, হাসি আর ফোটে না ফালাকাটা ও ময়নাগুড়ির গ্রামীণ মানুষের মুখে। এখনও সরকারিভাবে ঘোষিত হল না পুরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত। নীতিগত অবস্থান অনুযায়ী ২০১০ সালের ২৪ নভেম্বর তৎকালীন রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্ত অবস্থানের সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। বলা হয়, সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে আরও ২২টি নতুন পুরসভা গঠন করার পাশাপাশি ফালাকাটাকে পুরসভা করা হবে। পাশাপাশি ময়নাগুড়ির নামও সরকারের বিবেচনাধীন বলে পুরমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

দীর্ঘদিন ধরে দাবি থাকলেও এবং পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও ময়নাগুড়িকে এখনও পুরসভা হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। ফলে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন রাজনৈতিক দল থেকে সাধারণ মানুষ। তবে বিষয়, ফলে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনের আগে একটা নবনির্বাচিত সরকার সব দিক ভাবনাচিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নেবে না বলে তাঁর বিশ্বাস। অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নবনির্বাচিত সরকারের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ রাজ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা আনা। কারণ পূর্বতন সরকারের ঋণের মাশুল হিসাবে মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় হবে চলতি অর্থবর্ষ থেকেই। সুদ এবং আসল মিলে প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা, সরকারি কর্মচারীদের পে কমিশনের বর্ধিত অর্থ প্রদান সরকারের কাছে এখন 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি'।

অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটাকে পুরসভায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফালাকাটা-১, পারঙ্গেরপার পঞ্চায়েত এবং ফালাকাটা-২-এর নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে নতুন পুরসভার নাগরিক বিন্যাসের পরিকল্পনা করা হয়। সরকারের এই ঘোষণায় ফালাকাটায় খুশির ঢল নামে। কিন্তু পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদল পরিবর্তিত হবার ফলে নীতিগত সিদ্ধান্তটি আমলাতান্ত্রিকতার ফাঁসে আটকে পড়ে। ২০১৪-র ১১ জুন এক সরকারি বিবৃতিতে তৎকালীন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পুনরায় ফালাকাটাকে পুরসভা করার নীতিগত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ময়নাগুড়িকে পুরসভা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে দাবি ব্লক প্রশাসনের। ময়নাগুড়িকে পুরসভা হিসাবে গঠন করার একটি নথি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ময়নাগুড়ির বিডিও শ্রেয়সী ঘোষ। তবে রাজ্যে বিধানসভার চলতি অধিবেশনে পুরসভায় উন্নীতকরণ বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ একান্তই অসম্ভব বলে মনে করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক। তাঁর যুক্তি, যেহেতু বিধানসভার এই বাদল অধিবেশনে বাজেট প্রস্তাব পাশ করানোটাই সরকারের কাছে মূল আলোচ্য ফলে একটা-দুটো নয়, বিকেন্দ্রীকরণের নীতি হিসাবে ২২টি পঞ্চায়েত অঞ্চলকে পুরসভায় উন্নীত করার যে অর্থ, তার সংস্থান না করে আনুমানিক ঘোষণা করতে চাইছে না সরকার। আর সেই কারণেই কিছুটা হলেও হতাশ ময়নাগুড়ির তৃণমূল নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, অনেক আগে থেকেই ময়নাগুড়িকে পুরসভা করার প্রয়াস গ্রহণ করা উচিত ছিল। নীতিগত অবস্থান সরকারের শীর্ষনেতৃত্ব নিয়েছেন। তবে কবে হবে, সেটা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং জেলা প্রশাসনই বলতে পারবে।
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ময়নাগুড়িকে

পুরসভায় উন্নীত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ময়নাগুড়ির আরএসপি স্থানীয় নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, বামেরাই পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী এই দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে এসেছে। তবে দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে পুরসভার দাবিকে সামনে রেখেই ক্রমে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে ময়নাগুড়ি। তবে প্রক্রিয়া শুরু হলেও কবে ময়নাগুড়িকে পুরসভা ঘোষণা করা হবে, সেই ব্যাপারে সন্দিহান এলাকার মানুষজন।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য ছিল প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করা। এই ‘মিশন ভিশন’-এর লক্ষ্যে তিনি রাজ্যে যে ২২টি পুরসভার নাম ঘোষণা করেছিলেন, তার মধ্যে ফালাকাটার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ময়নাগুড়ির নামও বিবেচনার মধ্যে ছিল। তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে জানান, কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে আরও বিকেন্দ্রীভূত করে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে উন্নয়নের অভিমুখকে আরও গতিশীল করা এবং সমগ্র রাজ্যে সমান তালে ও সমভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য। রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, একটি এলাকাকে পুরসভায় উন্নীত করতে গেলে সেই এলাকার লোকসংখ্যা হতে হবে ন্যূনতম ৩০,০০০। ময়নাগুড়িতে এখনই লোকসংখ্যা ৪০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। পুর এলাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে কমপক্ষে ৭৫০ জন মানুষ বসবাস করতে হবে। ময়নাগুড়িতে রয়েছে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৫০ জন। সরকারি নীতি অনুযায়ী, অকৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা হতে হবে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ। ময়নাগুড়িতে অকৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা ৫৬ শতাংশ।

জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি অঞ্চল ‘গেটওয়ে অব ডুয়ার্স’ নামে পরিচিত। ডুয়ার্সের প্রবেশপথ হবার সুবাদে প্রতিনিয়ত পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে। পার্শ্ববর্তী গোরুমারা, চাপড়ামারি বা লাটাগুড়ি পর্যটনকেন্দ্রে যেতে গেলে ময়নাগুড়ি হয়েই যেতে হয়। চাহিদা মেটাতে প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে নতুন নতুন হোটেল, বাজার, বেড়ে চলেছে জনবসতির সংখ্যাও। বর্তমান পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় এই বেড়ে ওঠা নগরায়ণের চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে এলাকায় পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অভাব প্রকট হচ্ছে। তাই ময়নাগুড়ি পুরসভা হলে এলাকার জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবি মান্যতা পাবে বলে মনে করেন উন্নয়নকামী মানুষ।

এটা বিশ্বাস করা হয়, ফালাকাটার শৌলমারি আশ্রম সুভাষচন্দ্র বসুর পদধূলিধূসরিত। তবে ইতিহাস চাপা পড়ে আছে প্রশাসনিক আমলাদের স্তূপীকৃত ফাইলের তলায়। তা ছাড়াও স্বাধীনতা-পূর্ব জলপাইগুড়িতে ময়নাগুড়ির মতো ফালাকাটারও ব্যবসায়িক এবং আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গৌরবময় ইতিহাস ছিল। গভীর বনভূমি, উর্বর কৃষিক্ষেত্র, জলদাপাড়া বনাঞ্চল এবং কুঞ্জনগর ইকো পার্কে ঘেরা ফালাকাটাকে পঞ্চায়েত থেকে পুরসভায় উন্নীতকরণের সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়লেও এখনও তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সর্বস্তরেই। জনসংখ্যার দিক থেকে ফালাকাটায় ৫১ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৯ শতাংশ মহিলা। রাষ্ট্রীয় স্বাক্ষরতার হার যেখানে প্রায় ৬০ শতাংশ, সেখানে ফালাকাটায় এই হার ৭৬ শতাংশ। পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার ৮১ শতাংশ এবং মহিলাদের ৭১ শতাংশ। ফালাকাটা উচ্চবিদ্যালয় শহরের একটি অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয়, যেটি শহরের যে কোনও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিভাবক রূপে কাজ করে থাকে। এ ছাড়াও ফালাকাটা গার্লস’, যাদবপল্লী হাই স্কুল, সুভাষ গার্লস’ হাই স্কুল, পারঙ্গেরপার শিশু কল্যাণ হাই স্কুল নিয়মানুবর্তিতা এবং পঠনপাঠনে জেলার মুখ উজ্জ্বল করছে প্রতিনিয়তই। এ ছাড়াও ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চতর বিদ্যালয় রেমন্ড মেমোরিয়াল এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মানুষ গড়ার কারিগর রূপে কাজ করছে। ফালাকাটা কলেজ, ফালাকাটা বি এড কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজে ফালাকাটার পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চল থেকেও ছাত্ররা ভরতি হচ্ছে। একদিকে গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমে কৃষিজীবী পরিবারগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে, অন্য দিকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের মাধ্যমে উপার্জন করে একটু ভাল শহর ঘেঁষা জায়গায় বসতি স্থাপন করার প্রবণতাও বাড়ছে। ফলে স্বাভাবিক নগরায়ণ যখনই ঘটছে, তখন নগরোন্নয়নের প্রত্যাশা পঞ্চায়েতগুলি সামাল দিতে পারছে না, নাগরিক পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ফালাকাটার বিধায়ক অনিল অধিকারী বলেন যে, রাজ্য সরকার তার সীমিত আর্থিক সামর্থ্যে উন্নয়ন করে চলেছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আর্থিকভাবে রাজ্যকে দেউলিয়া করার দায় নিতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হচ্ছে। তবে অনতিবিলম্বেই ফালাকাটা পুরসভা হিসাবে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নথিভুক্ত হবে বলে বিশ্বাস এলাকার দ্বিতীয়বারের জন্য

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য ছিল প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করা। এই ‘মিশন ভিশন’-এর লক্ষ্যে তিনি রাজ্যে যে ২২টি পুরসভার নাম ঘোষণা করেছিলেন, তার মধ্যে ফালাকাটার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ময়নাগুড়ির নামও বিবেচনার মধ্যে ছিল।

নির্বাচিত হওয়া বিধায়কের। আশাবাদী সিপিআই (এম) আলিপুরদুয়ার জেলার শীর্ষনেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, ২০১০ সালে অশোক ভট্টাচার্য পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী থাকার সময়েই ফালাকাটাকে পুরসভায় উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তারপরেও এত সময় লাগে কেন বলে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তবে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক টালবাহানা এবং অর্থনৈতিক যুক্তির তত্ত্বকে খারিজ করে দিচ্ছেন আবেগকে সম্বল করে থাকা সাধারণ মানুষ। তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য, বিগত পাঁচ বছরে বর্তমান সরকার এক লক্ষ কোটি টাকা বাজার থেকে ঋণ করেছে। উন্নয়নের লক্ষ্যেই যদি ঋণ করা হয়ে থাকে, তাহলে ফালাকাটা এবং ময়নাগুড়িকে পুরসভায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে আর্থিক টানাপোড়েনের অর্থনৈতিক যুক্তি ধোপে টেকে না। বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা সঠিকভাবেই যুক্তি প্রদান করে বলেছেন, ‘উন্নয়নের নিরিখে সরকারকে ঋণ করতে হয়, ঋণ যথাসময়ে শোধও করতে হয়। সরকার ঋণ নেয় উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য। কিন্তু দানধ্যান, দয়াদাক্ষিণ্য বিতরণের জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা বাজার থেকে ঋণ করছে— এটা কোথায় শুনেছেন?’ তাই শেষ কথা হিসাবে বলাই যায়, বিতর্ক থাকবেই, বিতর্ক চলতে পারে সুস্থ কর্মমুখী প্রচেষ্টাপালনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আশু প্রয়োজন মানুষের আবেগকে সম্মান জানানো। ফলে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনেই গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঘোষিত হোক ফালাকাটা ও ময়নাগুড়ি পুরসভার সরকারি সিদ্ধান্ত।

গৌতম চক্রবর্তী

সেবা-উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশাসনিক অধিকার কতটা পাবে চা-ডাইরেক্টরেট?

উত্তরবাংলার জীবনপ্রবাহের ধমনি বলতে বোঝায় চা-বাগিচা শিল্পের অর্থনীতি। আজকের দার্জিলিং থেকে শুধু জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সই নয়, চা-বাগিচা এখন প্রসারিত হচ্ছে দিনাজপুর জেলার সীমান্ত ধরে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সমতল এলাকার বিস্তীর্ণ সমভূমির একদা কৃষি অঞ্চলে।

শাল, সেগুন, ধুপি আর টুন— সবুজের এই ঘন আঁচলের তলে ছিল গজরাজের বৃংহতি, হরিণের শঙ্কা ভরা মায়াবী চাউনি, ডোরাকাটার বলদীপ্ত হুংকার, সর্পরাজ শঙ্খচূড়ের হিমশীতল হিসহিস শাসানির পাশাপাশি ম্যালেরিয়ার বাহক মশককুলের হুল আর কালান্তক কালাজ্বরের মৃত্যুর হাতছানি। সেখানে আজ চা-বাগিচার সবুজ চাদর। ১৮৫৬ সালে আসামে চা সাম্রাজ্যের অভিষেকের (১৮৩৯) ১৭ বছর বাদে দার্জিলিঙের লেবঙের কাছে ধোতরে চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ১৮৭৪ সালে ডুয়ার্সের গাজোলডোবার কাছে চা-বাগানের যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকেই শুধু চা-বাগিচা শিল্প আর দার্জিলিং-ডুয়ার্সের ইতিহাসের আরেক নাম 'চা'।

যে বাগিচা শিল্পকে কেন্দ্র করে উত্তরবাংলার এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে নগরজীবনের প্রবাহ, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাকদার কার্শিয়াং, তিনধারিয়া ধরে তিস্তার ওপারের ডামডিম, ওদলাবাড়ি, মেটেলি, বীরপাড়া, বানারহাট ইত্যাদির মতন একের পর এক নগর, সেখানে আজ এক আতঙ্কের মেঘের ডাক এখানকার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। বন্ধ হচ্ছে মালিকের খুশিমতো একের পর চা-বাগান। চা শ্রমিকের কেজো দু'টি হাত কাজের জন্য তৈরি থাকলেও বন্ধ চা-বাগানের ফটক থেকে চরম হুঁশিয়ারি, তফাত যাও শুনে হাত দুটো গুটিয়ে যায়। কর্মহীন হাতে প্রথম কয়েকদিন ভিক্ষার কিছু কড়ির প্রতিশ্রুতি এলেও, কয়েকদিন পর সেই প্রতিশ্রুতি 'দেখছি দেখব' সান্ত্বনার বাণীতে রূপান্তরিত হলেও সেটাও মিলিয়ে যায়।

এইসব শ্রমিক এসেছিল দ্বিশত বছর আগে তাদের কয়েক হাজার বছরের বাসভূমি থেকে, বলতে গেলে একরকম বলপূর্বকভাবে বাধ্য হয়ে। যেমন আমেরিকা গড়তে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আফ্রিকা থেকে কালো চামড়ার দধীচিদের। পৃথিবীর সব বাগিচা শিল্পের শ্রমিক নিয়োগের একই ইতিহাস।

পৃথিবী জুড়ে চায়ের চাহিদা কফিপান হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে চায়ের দাম, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে। তবে ডুয়ার্সের চা-বাগিচায় এই বন্ধের খেলা কেন চলছে? চা-বাগিচার জমির মালিক রাজ্য সরকার। চা-বাগিচার মালিকরা এই জমি লিজে নিয়েছে বলতে গেলে প্রায় বিনামূল্যে। লিজের শর্ত অনুসারে চা-বাগিচা মালিকরা এই চা চাষ বন্ধ বা পতিত রাখতে বা অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। লিজ তো বাড়ি ভাড়ার মতো। ভাড়াটে মালিকের কাছে যে শর্তে ও যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাড়ি ভাড়া নেয়, তা মালিকের সম্মতি ছাড়া অন্যভাবে ব্যবহার করলে বাড়ির মালিক শর্তভঙ্গের দায়ে ভাড়াটেকে আইনগত উপায়ে উচ্ছেদ করতে পারে। চা-বাগিচা মালিকও যদি চা চাষ বন্ধ রাখে, সেটা হবে লিজের শর্ত ভাঙার মতন। রাজ্য সরকার

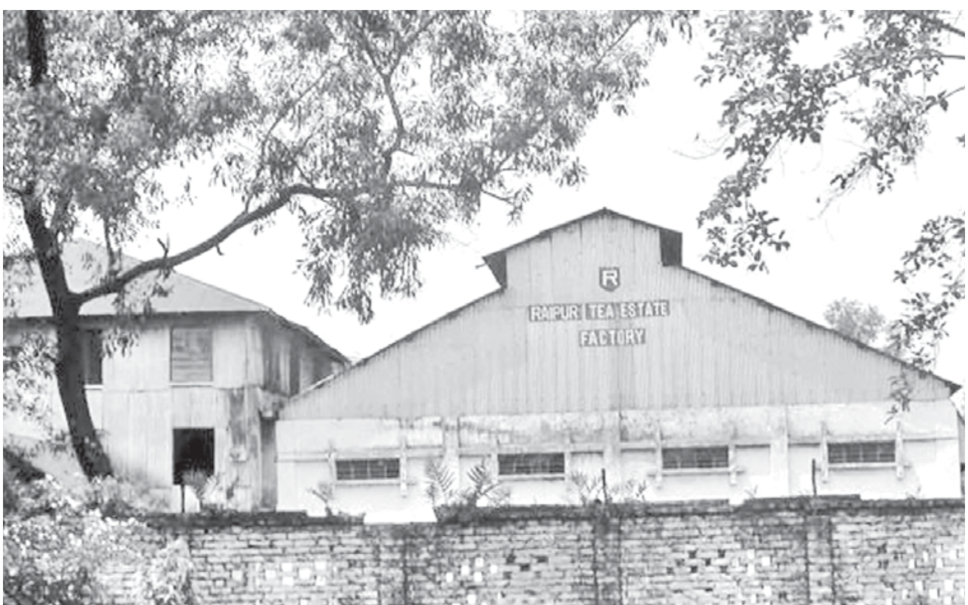

বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগান ও ফ্যাক্টরি খোলার ক্ষেত্রে টি ডাইরেক্টরেট কী ভূমিকা নেবে তা স্পষ্ট জানতে চায় উত্তরবঙ্গের পীড়িত চা-বলয়ের মানুষ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর গঠন করেছেন পৃথক চা-ডাইরেক্টরেট। চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর হাতে। তবে চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর অধিকার ও ক্ষমতার পরিধি কতখানি তা কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনও জানে না। সংবাদ মাধ্যমে এটুকু জানা গিয়েছে চা-বলয়ে যাবতীয় উন্নয়ন ঘটানোই এই বোর্ডের কর্তব্য।

লিজ বাতিল করতে পারে শর্ত ভাঙার দায়ে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য রাজ্য সরকারের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। বাগিচা শ্রম আইন রূপায়ণ করে লোকসভা। অর্থাৎ এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। তবে শ্রম আইন ভঙ্গ করলে রাজ্য সরকার অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে পারে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর গঠন করেছেন চা-বাগিচা উন্নয়ন বোর্ড। তার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর হাতে। দায়িত্ব তো পেয়েছেন, কিন্তু চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর অধিকারগুলি কী তা কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না। মনে হয় সৌরভবাবু নিজেও জানতে পারেননি তাঁর অধিকারগুলির পরিধিকে। ফলে সেগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তাঁর কী সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক অধিকার আছে, তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। সমস্যাটা এখানেই কিন্তু দেখা যাবে।

বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল। তার আগে ছিল কংগ্রেস সরকার। ডুয়ার্সের চা-বাগানে বাম-দলগুলোর একচ্ছত্র শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে। শ্রমিকদের বোঝাতে পেরেছিল, তারা ক্ষমতায় এলে চা-বাগিচা মালিকদের এই অনাচারের অবসান ঘটিয়ে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু তাদের এই সুদীর্ঘ শাসনকালে বন্ধ করা হয়েছে একের পর এক চা-বাগান। শ্রমিকরা তাদের অধিকারের দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইলে বামফ্রন্টের পুলিশ ও প্রশাসন মালিকের পক্ষ নিয়েছে। একদিকে কর্মহীন শ্রমিকরা অনাহারে মারা গিয়েছে আর বাগানের সম্পদ লুঠ করেছে ফাটকাবাজ চা মালিকরা। ফেঁপে-ফুলে উঠেছে তারকেশ্বর লোহারদের মতন তথাকথিত বামপন্থী নেতারা।

এবারের নির্বাচনে ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের প্রধান বিষয় ছিল এখানকার বন্ধ চা-বাগান ও শ্রমিকদের অধিকারগুলোকে মালিক যাতে মানতে বাধ্য হয়, তাকে কার্যকরী করার। তৃণমূল সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরে এই প্রথম এই রাজ্যের চা-বাগিচা তথা শ্রমিকদের জন্য 'করছি-করব'— এই মুখের প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চা-বাগিচার জন্য কিছু একটা করার সদিচ্ছা বাস্তবে দেখা গেল। রাজ্য সরকার গঠন করলেন টি ডিরেক্টরেট। প্রাথমিকভাবে এই দপ্তরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। এর প্রশাসনিক দপ্তর হচ্ছে শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ ভবনে। এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীকে।

উত্তরবাংলার অর্থনৈতিক প্রবাহের ধমনি চা শিল্পের জন্য টি ডিরেক্টরের চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্ব সৌরভ চক্রবর্তীর মতন একজন উদ্যমী তরুণের হাতে অর্পিত হওয়ায় চা-বলয়ের প্রত্যাশার পারদ যে আকাশচুম্বী হবে— এতে কোনও সন্দেহ নেই। এই প্রত্যাশার চাপ বহন করে তাকে পূরণ করার দায়িত্ব কিন্তু আরও বেশি। এতদিন এখানকার পর্বতপ্রমাণ সমস্যার দায় মেটাবার প্রশ্নে দূরের প্রশাসনের উপর ভরসা রাখার পরামর্শ দিয়ে স্থানীয়ভাবে দায়কে এড়াতে পারা যেত। এখন তো মনে হবে, চা-বাগিচা শিল্পের সুদীর্ঘ পচন ধরা ক্ষতকে নিরাময়ের জন্য বিশল্যকরণীর ঔষধি এখন টি ডিরেক্টরের কাছেই আছে। তাই সবার আগে স্থির করা দরকার, এই বোর্ডের সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কতখানি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ডানকান ব্রাদারস-এর বন্ধ চা-বাগিচাগুলোকে নির্বাচনী চমক দেখাতে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণের অর্ডন্যান্স জারি করার পর প্রচলিত জটিল আইনি গোলকধাঁধায় মুখ থুবড়ে পড়ার ঘটনায় নবগঠিত সংস্থাটির সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক অধিকার যদি না দেওয়া হয়, তবে এই সংস্থা গঠন ও তার জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ যতই রাজনৈতিকভাবে ভারী বলেই ঘোষিত হোক না কেন, সংস্থাটি অন্য আরও অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মতনই গণ্য হবে। অথচ প্রত্যাশার সব চাপ এসে পড়বে সরকার মনোনীত চেয়ারম্যানের উপর।

তরুণ উদ্যমী সৌরভ চক্রবর্তী এসেছেন এমন একটি পরিবার থেকে, যাঁরা এই উত্তরবাংলায় এক সম্মাননীয় পরিবার বলে গণ্য। সৌরভের বাবা এক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রয়াত সমীর চক্রবর্তী তাঁর শিক্ষকবৃত্তের বাইরে চা গবেষক ও বিশেষজ্ঞ বলে বন্দিত হন। কলকাতার মনীষা গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত চা-বাগিচা ও চা শ্রমিকের উপর গবেষণা পুস্তকটি চা-বাগিচা বিজ্ঞানের এক আকরগ্রন্থ বলে বিবেচিত। সেই পরিবারের উচ্চশিক্ষিত সন্তান সৌরভ চক্রবর্তী তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলের কারণে চা-বাগিচার নানা সমস্যার প্রসঙ্গে বাল্যকাল থেকেই পরিচিত। তাই তাঁকে এই সংস্থার দায়িত্ব অর্পণ করে

সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক অধিকার যদি না দেওয়া হয়, তবে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ যতই রাজনৈতিকভাবে ভারী বলেই ঘোষিত হোক না কেন, সংস্থাটি অন্য আরও অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মতনই গণ্য হবে। অথচ প্রত্যাশার সব চাপ এসে পড়বে সরকার মনোনীত চেয়ারম্যানের উপর।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগ্যতম ব্যক্তিকেই খুঁজে নিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রশ্নটাই উঠে আসবে আবার— সেনাপতি যতই সাহসী ও যোগ্যতম হোন না কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করতে তাঁর তূণে যদি উপযুক্ত অস্ত্র না দেওয়া যায়, তবে কিন্তু নিছক সাহসে ভর করে শত্রুর মোকাবিলা করতে যাওয়ার অর্থ হয় বন্দি হওয়া, নয়ত বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। আর এ ক্ষেত্রে কোনও সংস্থার শক্তিশালী হাতিয়ার তার সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকার।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, এটা ছিল শিল্প। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা রূপান্তরিত হয়েছে গদি ব্যবসার চরিত্রে। আর এই ব্যবস্থাটির পরিবর্তন ঘটেছে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল অর্থাৎ মাত্র ২০ বছরের মধ্যে একেবারে যেন হুড়মুড়িয়ে।

ব্রিটিশ মালিকানাধীন চা শিল্পগুলো যে শ্রমিকের স্বার্থ দেখত এমন নয়। তবে শিল্প মালিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, তারা তাদের শিল্পজাত দ্রব্যের মানকে বজায় রাখতে চায়। ফলে চা-বাগানের পরিচর্যা ও শিল্প পরিবেশ রাখার জন্য তারা কিছু পদক্ষেপ নিত। পুরনো গাছের পরিবর্তে নতুন চারাগাছ রোপণ করত। ফাটকাবাজ

এতদিন এখানকার পর্বতপ্রমাণ সমস্যার প্রশ্নে দূরের প্রশাসনের উপর ভরসা রাখার পরামর্শ দিয়ে স্থানীয়ভাবে দায় এড়ানো যেত। এখন তো মনে হবে, চা-বাগিচা শিল্পের সুদীর্ঘ পচন ধরা ক্ষতকে নিরাময়ের জন্য বিশল্যকরণীর ঔষধি এখন টি ডিরেক্টরের কাছেই আছে।

গদি ব্যবসায়ী চা-বাগিচার মালিকের উদ্দেশ্য, শিল্পে উন্নয়নের পরিবর্তে শুধু মুনাফা।

চা-বাগিচার এই ফাটকাবাজ লবি মহারাষ্ট্রের চিনি লবির মতন প্রচণ্ড শক্তিশালী। এরা সেখানকার রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তরবঙ্গের এই ফাটকাবাজ চা লবিও এখানকার রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং বহু ক্ষেত্রে তা করেও থাকে। সৌরভ চক্রবর্তীর প্রতিপক্ষ এই প্রচণ্ড শক্তিশালী লবি। তাকে মোকাবিলা করার জন্য তাঁর মনে জোর রাখার পাশাপাশি শক্তিশালী হাতিয়ারেও সজ্জিত হওয়া চাই।

এখানে এখন কৃষিজমিতে গড়ে উঠছে অসংখ্য ক্ষুদ্র চা-বাগান। এদের অধিকাংশই ভূমি দপ্তরের অনুমতি না নিয়েই কৃষিজমিতে চা রোপণ করেছে বলে এদের নাম সরকারি নথিতে নেই। ফলে এখানে এই ধরনের কত চা-বাগিচা আছে, তার প্রকৃত হিসেব নেই। সরকারি স্বীকৃতি না থাকার ফলে এরা টি বোর্ড বা অন্য কোনও সংস্থা থেকে কোনও সরকারি অনুদানের অর্থ পায় না। অথচ বিশাল আয়তনের কৃষিজমি অদৃশ্য হওয়ার পাশাপাশি এক বিপুল সংখ্যক মানুষের ভাগ্য এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

চা-বাগিচা শ্রমিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যে নিজেদের শ্রমজীবী তথা শ্রমিক হিসাবে ভাবতে চায়। এদের হাতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়ার সময় দেখা গিয়েছে, বাঁচার তাগিদে তারা সেগুলি নিয়েছে বটে। সেই সঙ্গে এক গভীর আর্তির সুরে জানিয়েছে, 'আমাদের ভিখারি বানিয়ে দিয়ো না কমরেড। আমাদের বাগান খোলার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাদের কাজ ফিরিয়ে দাও। আমরা পেতে চাই ত্রাণের পরিবর্তে কাজ করে তার মজুরি।'

মনে পড়ে, বন্ধ চটকল শ্রমিকদের জন্যও একদিন এভাবে কৌটো ঝাঁকিয়ে অর্থ তুলতে রাস্তায় রাস্তায় বার হত। তারপর ধীরে ধীরে ঝাঁকুনি বন্ধ হল। কানোরিয়া চটকলের শ্রমিকরা সমবায় আন্দোলন করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিল। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, তা ভাঙার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। যেমন সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকদের সমবায় আন্দোলন ভাঙা হয়েছে। সেই আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে অনেকে মন্ত্রী হয়েছেন। শ্রমিকের অনাহার মেটেনি।

চা শ্রমিকদের পরমহিতৈষী সমীর চক্রবর্তীর পুত্র সৌরভ চক্রবর্তী জলপাইগুড়ি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা যদি সমবায় করে বাগিচা চালাতে

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগ্যতম ব্যক্তিকেই খুঁজে নিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রশ্নটাই উঠে আসবে আবার— সেনাপতি যতই সাহসী ও যোগ্যতম হোন না কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করতে তাঁর তূণে যদি উপযুক্ত অস্ত্র না দেওয়া যায়, তবে কিন্তু নিছক সাহসে ভর করে শত্রুর মোকাবিলা করতে যাওয়ার অর্থ হয় বন্দি হওয়া, নয়ত বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা।

চায়, তবে তাদের জন্য ব্যাঙ্ক সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে। চা-শ্রমিকরা এই ঘোষণায় যারপরনাই আশান্বিত হয়েছিল, এবং বিখ্যাত পরিবেশবিদ চিন্ময় ঘোষকে তাদের আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। সেই আন্দোলনে চিন্ময়বাবুর ঘনিষ্ঠ সমীর চক্রবর্তী এবং সৌরভ চক্রবর্তীও তাদের পাশে ছিলেন। তার উপযুক্ত প্রতিদান তারা দিয়েছে এই নির্বাচনে সৌরভবাবুকে বিপুলভাবে সমর্থন জানিয়ে।

প্রত্যাশার ওজন খুব ভারী। তাই সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলে যেমন সাফল্যের মুকুট জ্বলে ওঠে, আবার প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হলে প্রত্যাশার ভারে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। সৌরভ চক্রবর্তীর রাজনৈতিক জীবনে এই টি ডিরেক্টরেটের চেয়ারম্যানের পদটি তাই এক পেন্ডুলামের মতন বিরাট চ্যালেঞ্জ— প্রত্যাশাপূরণের সাফল্য ও ব্যর্থতা কোন দিকে দুলবে, তারই উপর নির্ভর করে আছে তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তার জিয়নকাঠি।

সৌমেন নাগ

উত্তরের পরিবহণে নতুন অধ্যায় শুরু হল?

উত্তরের পরিবহণব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে এবার যথেষ্ট সিরিয়াস তা পরিষ্কার বোধগম্য হল গত ২৯ জুন উত্তরকন্যার বৈঠকে। আগেই তিনি অনুভব করেছিলেন, উত্তরের মানুষের মনের আরও কাছাকাছি পৌঁছাবার অন্যতম সহজ পথ হল উত্তরের লাইফলাইন রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। তিনি জানতে পেরেছেন, সংস্থাটির চরম খারাপ অবস্থাতেও সাধারণ মানুষের আস্থা অটুট ছিল। দলীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৪ জুন বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে ফোন করে তাঁকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দায়িত্ব দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। অথচ তার দিন তিনেক বাদেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, সে দিন সকালেই চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার আবার গ্রহণ করছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। মিহিরবাবু এর পর এ নিয়ে কোথাও কোনওভাবে মুখ খোলেননি, কিন্তু সূত্রের খবর অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ সফরে এসে কথা প্রসঙ্গে সে খবর শুনে মুখ্যমন্ত্রী নাকি অবাকই হয়ে যান। গত ২৯ জুন উত্তরকন্যায় বৈঠকের আগে এ নিয়ে কলকাতায় কথা বলে জানতে পারেন, পরিবহণ দপ্তরের কারও ভুল বোঝাবুঝিতে বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক তাঁর নির্দেশ পালিত হয়নি। এর পর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নতুন অর্ডার পৌঁছে যায় তাঁর কাছে। খানিক বাদেই সদ্য তিন সপ্তাহের পুরনো চেয়ারম্যানকে সরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি নিজেই ঘোষণা করলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান হিসেবে মিহির গোস্বামীর নাম। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের অভিমত, উত্তরের পরিবহণ নিয়ে এবার কিছু হলেও হতে পারে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের হিসেবমতো সংস্থার ৩১তম চেয়ারম্যান হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার পর উদ্দীপনা বহু মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছ থেকে জানা গেল। এগারো সালে তৃণমূল সরকার আসার পর এই প্রথম চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানাতে হাজির হন সিটু সমর্থিত শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও। তাঁদের মত, মিহিরবাবুর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সম্পর্ক বহু দিনের এবং ওঁর গ্রহণযোগ্যতা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। পরিবহণের পদস্থ কর্তাদের বক্তব্য, এবার অভিভাবকের মতোই একজনকে পেয়েছেন নিগমের কর্মীরা, যিনি অনেকটা সময় দিতে পারবেন সংস্থার উন্নয়নের জন্য।

দায়িত্ব নিয়েই নতুন চেয়ারম্যান জানিয়ে দিয়েছেন, নিগমকে স্বনির্ভর করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। কেবলমাত্র পরিবহণ দপ্তরের সাহায্যই নয়, কর্মীদের আন্তরিক অংশগ্রহণ ছাড়া যা কখনও সম্ভব নয়। গোড়া থেকেই তাই টার্গেট বেঁধে এগতে চান মিহিরবাবু। তাঁর বক্তব্য, নতুন নতুন বাস আসবে এবং রাস্তায় বাস যত বেশি চলবে, সংস্থার আয় বাড়বে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে বাস যত পুরনো হতে থাকবে, রক্ষণাবেক্ষণ-মেরামতির খরচ তত বাড়তে

উত্তরের মানুষের আস্থা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ওপর আজও অটুট। আর সেই আস্থায় ভর করেই নিগমের সাজে সেজে উঠছে বেসরকারি পরিবহণের বাস। বলাই বাহুল্য, বহু মানুষ রোজ ভুল করছেন, নিগমের বাস ভেবে উঠে পড়ছেন চোখ বুঁজে।

মিহিরবাবুর বক্তব্য, নতুন নতুন বাস আসবে এবং রাস্তায় বাস যত বেশি চলবে, সংস্থার আয় বাড়বে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে বাস যত পুরনো হতে থাকবে, রক্ষণাবেক্ষণ-মেরামতির খরচ তত বাড়তে থাকবে। প্রথম বোর্ড মিটিং-এই তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, মাসিক আয় ১.৫ থেকে ২ শতাংশ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনই তেল খরচ কমাতে হবে ০.৩ শতাংশ।

থাকবে। প্রথম বোর্ড মিটিং-এই তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, মাসিক আয় ১.৫ থেকে ২ শতাংশ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনই তেল খরচ কমাতে হবে ০.৩ শতাংশ। আর যেখানে-সেখানে বাস ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যাপারে ডিভিশনাল ম্যানেজারদের আরও সক্রিয় হওয়ার জন্য সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি রোধের পাশাপাশি মিহিরবাবু সংস্থার সার্ভিস ও ডিসিপ্লিনারি রুলে পরিবর্তন আনতে চান। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে হাই কোর্টের এক সিনিয়র অ্যাডভোকেটকে নিযুক্ত করা হবে। দপ্তরে ইতিমধ্যেই কয়েকজন অ্যাডভোকেটের আবেদনপত্র এসেছে, তা থেকেই একজনকে নির্বাচন করবেন চেয়ারম্যান সাহেব। তাঁর মতে, শৃঙ্খলাবোধ নতুন করে তৈরি হলে দুর্নীতি আপনা থেকেই কমে যায়। এর পর তো নজরদারি বাড়ছেই।

একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়েছেন বিকল্প আয় বাড়াবার উপর। কোচবিহারে ডালখোলা, রায়গঞ্জের মতো বেশ কিছু জমি সংস্থার নামেই আছে অথচ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সেসব জায়গায় পিপিপি মডেলে মোটেল, পেট্রোল পাম্প বা সুপারমার্কেট করা যায় কি না তা নিয়েও উদ্যোগী হয়েছেন মিহির গোস্বামী। এইসব পড়ে থাকা জমির স্বত্বাধিকার দ্রুত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বলে ঠিক হয়েছে। পর্যটন দপ্তরে যুক্ত ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে এ নিয়ে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করা হয়েছে। মিহিরবাবুর ইচ্ছে, যেসব জমির কাগজপত্র ঠিকঠাক আছে, সেগুলির প্রজেক্ট প্ল্যান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাঁর কথা, হাতে সময় কম, তাই কাজ করতে হবে দ্রুত।

পরিবহণ নিগমের বিকল্প আয়ের পথ হিসেবে পর্যটনকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চান মিহির গোস্বামী। তাঁর মতে, বাম-আমলে নিগমের যে পর্যটন প্যাকেজগুলি চলত, তার গুণমান নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল এবং আয় ছিল যৎসামান্যই। তাঁর মতে, সম্ভবত সে জন্যই তৃণমূল সরকার আসার পর নতুন চেয়ারম্যান সেই পর্যটন বিভাগ বন্ধ করেছেন। কারণ যথেষ্ট লাভজনক করতে হলে বিকল্প আয় হিসেবে পর্যটনকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েই ভাবতে হবে। এর মধ্যেই তিনি প্রাথমিক আলোচনা সেরে ফেলেছেন পর্যটন মন্ত্রী ও মুখ্য পর্যটন সচিবের সঙ্গে। আসন্ন মরশুমের কথা মাথায় রেখে পর্যটন দপ্তরের পরামর্শ ও সহায়তা আশা করেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বর্তমান এমডি সি মুরুগান সাহেব এর আগে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের এমডি হিসেবেও কাজ করেছেন। মিহিরবাবু তাঁর সঙ্গেও দেখা করে নানা পরামর্শ নিয়েছেন। যাতে পরিবহণ নিগম পর্যটন দপ্তরের পূর্ণ সহায়তা নিয়ে কাজ করতে পারে, সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মিহিরবাবু জানালেন, পর্যটন পরিষেবা চালু হতে চলেছে আগামী মরশুম থেকেই।

পরিবহণ নিগমের সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়েও যথেষ্ট সচেতন রয়েছেন মিহির গোস্বামী। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ে নিগমের বাসে নামমাত্র মূল্যে যাতায়াতের জন্য ‘স্কুলবন্ধু’ স্কিম চালু করতে চান তিনি। একই সঙ্গে নিত্যযাত্রীদের জন্য স্বল্প মূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে মাসিক ও ত্রৈমাসিক লয়ালটি কার্ড চালু করতে চাইছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়েই এগুলি চালু করতে চান মিহিরবাবু। নিগমের এক পুরনো কর্মীর বক্তব্য, এই সংস্থার আগাপাশতলা দীর্ঘদিন ধরে জানেন মিহির গোস্বামী, ডিরেক্টর হিসেবে থাকার সময় তাঁর বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত ও কার্যকরী হয়। অতএব তাঁকে চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে সঠিক কাজই করেছে সরকার।

ইতিমধ্যেই কাজের ময়দানে নেমে পড়েছেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান। প্রথম বোর্ড মিটিংয়ে বসার আগেই সেরে ফেলেছেন একপ্রস্থ কাজকর্ম। কলকাতায় চাঁদনিচক অফিস ঘুরে চলে যান উল্টোডাঙায় নিগমের ওয়ার্কশপে। সেখানকার নিগমের বহুতল বিল্ডিংটি দীর্ঘদিন অকেজো পড়ে আছে, সেটিকে সারাই করে একটি কম বাজেটের অতিথিশালা করতে চান তিনি। তাঁর মতে, এতে উত্তরবঙ্গ থেকে নানা কাজে যেসব মানুষ কলকাতায় আসেন তাদের জন্য স্বল্প খরচে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হতে পারে। আবার অব্যবহৃত বিল্ডিং থেকে নিগমের কিছু আয়ও হতে পারে। পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই বিধানসভায় এবং তারপর রায়গঞ্জে দেখা

উত্তরবঙ্গের পথে এখনও এইরকম ঝুঁকিপূর্ণ বেসরকারি পরিবহণ চলছে বহু রুটে, যেখানে পরিবহণ নিগমের বাস পরিষেবা নেই কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। নিগমের দায়িত্ব ও পথ চলা এখনও অনেক বাকি।

করেছেন মিহিরবাবু। পরিবহণ সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রাথমিক বিস্তারিত আলোচনাতেও তিনি সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছেন বলে জানান। আগামী ৩ আগস্ট পরিবহণ মন্ত্রী কোচবিহারে আসছেন, সে সময় নিগম নিয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানা যেতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দায়িত্ব হাতে পাওয়ায় দৃশ্যতই খুশি কোচবিহারের সাধারণ মানুষ—বহুদিন পরে আবার জেলার মানুষের হাতে ঘুরে এসেছে বলে। অখুশি নয় আলিপুরদুয়ারের মানুষও। মিহিরবাবু যোগ্য লোক, আর সৌরভকে অন্যান্য গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অতএব রাগ বা মন খারাপ করার প্রশ্নই নেই—আলিপুরদুয়ারের মানুষের কাছেই জানা গেল, পারিবারিক সূত্রে মিহিরবাবুর আলিপুরদুয়ারে নিয়মিত যাতায়াত ও থাকাখাওয়া চালু আছে। কয়েকদিন আগেও তাঁকে আলিপুরদুয়ার থেকে নিগমের বাসে চেপে কোচবিহার ও শিলিগুড়ি যেতে দেখেছে মানুষ। স্থানীয় মানুষের অনেকেরই অভিমত, নিগমের সঙ্গে মিহিরদার সম্পর্ক পুরনো ও নিবিড়, তাই ওনার প্রচেষ্টা আন্তরিক হবে বলাই বাহুল্য।

মিহির গোস্বামীর হাতে পরিবহণ নিগমের দায়িত্ব যাওয়ায় যথেষ্ট আশাবাদী জলপাইগুড়ির বাসিন্দারাও। জলপাইগুড়ির বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা, আলিপুরদুয়ারের আগের বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় এঁদের সঙ্গে মিহিরবাবুর সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল, অতএব বাস পরিষেবায় জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জেলার নানা প্রান্তে উন্নতিই ঘটবে বলে ধারণা তাঁদের।

পরিবহণ মন্ত্রকের দায়িত্ব শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতার হাতে দেওয়ায় অনেকেরই ধারণা এবার এ রাজ্যের পরিবহণে বৈপ্লবিক সংস্কার আনতে উদ্যোগী হবে মমতা সরকার। ভর্তুকি দিয়ে চলা রুগ্ন রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাগুলির অবস্থার উন্নয়নে ইতিমধ্যেই কলকাতার তিন সংস্থাকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে যা আশাপ্রদ। ভবিষ্যতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনুকরণেই পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হবেন মুখ্যমন্ত্রী, তার ইঙ্গিত মিলেছে। সে কথা মাথায় রেখেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দায়িত্ব যে বলিষ্ঠ নির্ভরযোগ্য হাতে দিয়েছেন সে ব্যাপারে অনেকাংশেই একমত রাজনৈতিক মহল। ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে অতি দ্রুত এগতে চাইছেন মিহির গোস্বামী, সেটা তাঁর কথাতেই পরিষ্কার। তাই সংবাদ মাধ্যমে কোনও ‘গিমিক’-এ বিশ্বাসী নন তিনি। তবে আগামী দিনে তাঁর ছোট ছোট অনেক কর্মকান্ডই যে সবাইকে চমকে দিতে পারে সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বিশেষ প্রতিবেদন

> পর্যটনকে বিকল্প আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস করতে আগ্রহী মিহির গোস্বামীর মতে, বাম-আমলে নিগমের যে পর্যটন প্যাকেজগুলি চলত, তার গুণমান নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল এবং আয় ছিল যৎসামান্যই।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

একই অঙ্গে নানা রূপ নিয়ে

‘মেডিক্যাল কলেজ’ তকমার অপেক্ষায় ‘নেই রাজ্য’

কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল

মোদি সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনের অন্তর্গত ‘কায়াকল্প’ প্রকল্পে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলা হাসপাতালকে পেছনে ফেলে দিয়ে ৮৮.২ শতাংশ পেয়ে পরিচ্ছন্নতাসহ আরও নানা বিভাগে প্রথম হয়েছিল কোচবিহার সদর অর্থাৎ এমজেএন হাসপাতাল। তার জন্য পুরস্কারমূল্যও কিছু কম ছিল না— ৫০ লক্ষ টাকা। সেই সময় পুরস্কারের টোপে পরিচ্ছন্নতার বহর ছিল দেখার মতো। রং করা থেকে শুরু করে হোর্ডিং লাগানোসহ বিছানা, পর্দা— সবকিছু এক্কেবারে ঝাঁ-চকচকে। রাতারাতি ভাঙা, ব্যবহারের অযোগ্য স্ট্রেচার হাওয়া হয়ে নতুন স্ট্রেচার, কিছু ক্ষেত্রে স্ট্রেচারের উপর নতুন মোড়ক দিয়ে নীল-সাদায় সেজে উঠেছিল সদর হাসপাতাল। কয়েক দিনের খাটাখাটনির পুরস্কারও একেবারে হাতে গরমে দিয়ে গিয়েছেন পরিদর্শকের দল। তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটা মাস। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার যত্রতত্র নোংরা আবর্জনায় স্বমহিমায় ফিরে যাচ্ছে সে। বর্তমান সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর আপাতদৃষ্টিতে পরিষ্কার মনে হলেও একটু ভাল করে ঘুরে দেখলেই শরীর খারাপ হতে বাধ্য।

এত ট্রেনিং, এত সচেতনতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাসপাতালের পিছন দিকে মর্গের পাশে রয়েছে ভ্যাট। হাসপাতালের সমস্ত বর্জ্য বিভিন্ন রঙের প্লাস্টিকে করে জমা করার পর সেখানে ঠাঁই পায়। সেই জায়গার অবস্থা দুর্বিষহ। পাশ দিয়ে একটা রাস্তাও রয়েছে। ওই জায়গা নিয়মমতো পরিষ্কার না হওয়ায় সেই আবর্জনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে গিয়ে দূষণ ছড়াচ্ছে, যা এলাকাবাসী ও পথচারীদের

যথেষ্ট কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাসপাতালের প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে আবর্জনা পার করে জলকাদা ডিঙিয়ে নার্সেস হস্টেল থেকে হাসপাতালে যাওয়া-আসা করতে হয় ডিউটিরত নার্সিং স্টাফ এবং নার্সিং স্টুডেন্টদের।

তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেই ৪০০ বেডের এই হাসপাতালে ১০০ বেড বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাগজে-কলমে হাসপাতাল ৫০০ বেড হলেও বাস্তবে তা নেই বলেই অভিযোগ নানা স্তরে। হাসপাতালে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মনে হল, যেন এটা একটা 'নেই রাজ্য'। চিকিৎসক নেই, নার্স নেই, ওয়ার্ড মাস্টার নেই, জিডিএ নেই, সুইপার নেই। শুধু নেই আর নেই। তারই মধ্যে রোগীদের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত কর্তব্যরত কর্মীদের। তাঁরাই জানালেন রোগীর সংখ্যা বাড়লে পর্যাপ্ত পরিমাণ বেডের অভাবে এখানে একসঙ্গে দু'জন রোগীকে রাখা খুবই সাধারণ ঘটনা। এমনকি শীতের রাতে বারান্দাতে থাকাও আকছার হয়ে থাকে।

আরও জানা গেল, এত বড় হাসপাতালে তিন শিফ্টে পাঁচজন ওয়ার্ড মাস্টার থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে মাত্র তিনজন সেই কাজটি করছেন। এঁদের মধ্যে একজনের সামনেই রিটায়ারমেন্টের সময়। নতুন কোনও লোক না এলে তখন মাত্র দু'জনকে দিয়ে কেমন কাজ হবে তা উপরওয়ালারাই জানেন।

এবার আসা যাক যাঁরা আপৎকালীন পরিস্থিতি সামলান, সেই নার্সিং স্টাফদের কথায়। মাত্র ১৪২ জন নার্সিং স্টাফকে নিয়ে চলছে এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের এতগুলো বিভাগ। নার্সিং সুপারিনটেনডেন্টের স্থায়ী পদ ফাঁকা। চারজনের মধ্যে তিনজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট। এঁদেরই একজনকে দিয়ে সামলানো হচ্ছে অফিস। ওয়ার্ডে সিস্টার ইনচার্জ তেরোজন। যেখানে তিনজন রোগীপ্রতি একজন করে নার্সিং স্টাফ থাকার কথা, সেখানে তিন শিফ্টে তাঁদের অনুপাত সহজেই অনুমেয়। সিসিইউ, লেবার রুম, ওটি ছাড়া সর্বত্রই নার্সিং স্টাফের হাহাকার। জানা গেল, আগের তুলনায় সরকারি ছুটি অনেক বেড়েছে। কিন্তু সেই ছুটি দু'-একজন একসঙ্গে নিলেই তখন বিভিন্ন ওয়ার্ড সামলানো মুশকিল হয়ে যায়।

হাসপাতালে ১৩০ জন জিডিএ থাকার কথা হলেও বর্তমানে পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে মাত্র ৫৬ জন রয়েছেন। আউটডোরে আরও জনা দশেক। যার ফলে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। ইমার্জেন্সিতে আসা অসুস্থ বা গুরুতর জখম রোগীকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবার জন্য বেশির ভাগ সময়ই স্ট্রেচার ধরার লোক পাওয়া যায় না। সেই কাজটা রোগীর আত্মীয়দেরই করতে হয়। একই অবস্থার শিকার অপারেশন হওয়ার পর

এমজেএন হাসপাতালত চত্বর ও করিডরের সাম্প্রতিক ছবি

রোগী। তাঁকে বেডে শিফ্‌ট করাতে নাজেহাল হতে হয় আত্মীয়স্বজনকে।

সুইপার পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকার কারণে হাসপাতাল চত্বরের নোংরা আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। তাঁদের কাছেই শোনা গেল, বেশ কিছু বছর আগেও নাকি পঁয়ত্রিশজন সুইপার ছিলেন। তাঁদের অনেকে অবসরগ্রহণের পর নতুন কেউ বহাল হয়নি। এখন বেড ও রোগীর সংখ্যা বাড়ার পর বর্তমানে তা কমে আঠারোজনে দাঁড়িয়েছে, যার ফল হাতেনাতে পাচ্ছেন চিকিৎসা

> গলব্লাডার অপারেশনের রোগী চার-পাঁচ মাস ঘুরেও সার্জেনের ডেট পান না। এক প্রকার বাধ্য হয়েই বাড়ি, জমি, গোরু বিক্রি করে বাইরে অপারেশন করাতে হয়। ডেটের জন্য ঘুরতে ঘুরতে রোগীমৃত্যুও বিরল নয়। একই অবস্থা মেডিক্যাল ওয়ার্ডে। মাত্র দু'জন ফিজিশিয়ানকে দিয়ে চলছে এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল।

করাতে আসা রোগী ও তাঁর পরিজনরা।

এবার চিকিৎসকদের কথা। এমজেএন হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে কয়েক বছর যাবৎ 'কে বা প্রাণ আগে করিবেক দান'-এর মতো স্বেচ্ছাবসরে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। একের পর এক চিকিৎসক চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় এবং সেই শূন্য পদে কোনও চিকিৎসক না আসায় ভোগান্তির চরম হচ্ছে রোগীদের। মাঝখান থেকে ফুলেফেঁপে উঠছে বিভিন্ন বেসরকারি নার্সিং হোম।

প্রতিটি আউটডোরে সকাল ১০ থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চিকিৎসকদের থাকার কথা। অথচ মাঝেমধ্যেই দেখা যায়, কিছু সময়ের জন্য চিকিৎসকের আসন ফাঁকা। সেই সময়টা তাঁরা কোথায় যান তা জানার জন্য জ্যোতিষী হওয়ার দরকার পড়ে না। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় হোমিয়োপ্যাথি আউটডোর। সেখানে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় রোগী দেখেন ডাক্তারদিদি। যদিও ডাক্তাররা পালটা যুক্তি দিতেই পারেন, টিকিট কেটে কাউকে ডাক্তার না দেখিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে এমন অভিযোগ নেই। তাঁরা যে চুলোতেই যান না কেন, তাঁদের দাবি দিনের শেষে আউটডোরের সব রোগীকেই দেখেন তাঁরা।

বর্তমান সরকারের দৌলতে ওটি-সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে কোনও কিছুরই অভাব নেই। দামি অপারেশন টেবিল থেকে শুরু করে হাসপাতালের যন্ত্রপাতি যথেষ্ট উন্নতমানের। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু বছর যাবৎ হিস্টেকটমি অপারেশন বন্ধ রয়েছে এখানে। প্রায় ১০ বছর বন্ধ কিডনি অপারেশনও। অথচ শহরের বিভিন্ন নার্সিং হোমে কিন্তু এই অপারেশনগুলো আকছার হয়। আর যেসব চিকিৎসক করছেন, তাঁরা কেউই বাইরে থেকে উড়ে আসছেন না।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের অবস্থাও তথৈবচ। সেখানে খাতায়-কলমে দু'জন থাকলেও এতদিন মাত্র একজনকে দিয়েই কাজ চলছিল। পরিস্থিতি সামলানোর জন্য প্রজেক্টের মাধ্যমে একজন অবসরপ্রাপ্ত সার্জেনকে এখানে দেওয়া হয়েছে ক'বছর আগে। তবে মাসখানেক হল নতুন একজন জয়েন করেছেন, বর্তমানে অবশ্য তিনিও ছুটিতে। ফলে গলব্লাডার অপারেশনের রোগী চার-পাঁচ মাস ঘুরেও সার্জেনের ডেট পান না। এক প্রকার বাধ্য হয়েই বাড়ি, জমি, গোরু বিক্রি করে বাইরে অপারেশন করাতে হয়। ডেটের জন্য ঘুরতে ঘুরতে রোগীমৃত্যুও বিরল নয়। একই অবস্থা মেডিক্যাল ওয়ার্ডে। মাত্র দু'জন ফিজিশিয়ানকে দিয়ে চলছে এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। বাকিটা চালাচ্ছেন ডিপ্লোমাধারীরা। শুধু ওয়ার্ড নয়, বহির্বিভাগও চলছে এইভাবে। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এই অব্যবস্থা চলে আসছে। অথচ কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

হাসপাতালে ছানি অপারেশন করালে রোগীদের বিনামূল্যে ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স দিচ্ছে সরকার, কিন্তু সেখানেও চিকিৎসকের অভাব। জানা গেল একজন স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন, একজনকে বদলি করা হয়েছে বিভাগের অভ্যন্তরীণ কারণে। একজন মাত্র চিকিৎসক ছিলেন এতদিন। তিনিও শারীরিকভাবে সুস্থ নন। সদ্য ন্যাশনাল রুরাল হেল্‌থ মিশনের প্রকল্পে একজন চিকিৎসক পাওয়া গিয়েছে। মাঝে অপারেশন থিয়েটারে সংক্রমণের জন্য প্রায় বছরখানেক বন্ধ ছিল ছানি অপারেশন। যদিও ওটি-র অটোক্লেভ মেশিনটি এখনও মাঝেমধ্যেই অসহযোগিতা করে থাকে বলে অভিযোগ। যা-ই হোক,

নভেম্বর মাস থেকে আবার অপারেশন চালু হয়েছে। অবাক হবার বিষয়, গত সাত মাসে অপারেশন হওয়া রোগীর সংখ্যা মাত্র ১৪০ জন। বাইরের ক্লিনিকে অবশ্য ছানি অপারেশনের সংখ্যা দেখলে তাক লেগে যেতে হয়।

হাসপাতালে আরও একটি গোলমেলে ব্যাপার কানে এল, অপারেশন চলাকালীন অ্যানাস্থেসিয়া চিকিৎসকের হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার নিয়মিত কাহিনি! অজ্ঞান করার পর অপারেশন চলাকালীন রোগীর শারীরিক দেখভালের দায়িত্ব মূলত তাঁরই। কিন্তু মজার বিষয় হল, এখানে মাঝেমধ্যেই অন্য দৃশ্য দেখা যায়। অভিযোগ, রোগীকে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার পর অপারেশন চলাকালীন প্রায়ই ডাক্তারবাবু বাইরে চলে যান। এ নিয়ে নিন্দুকরা নানা কথা বললেও অনুসন্ধানের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের।

বর্তমানে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড নিয়ে দেশ উত্তাল। দিদি আসন্নপ্রসবা মায়েদের জন্য নিশ্চয়যান থেকে শুরু করে নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, অন্য চিকিৎসকের রোগীকে নিজের আন্ডারে ভরতি করার অনীহা। প্রসবযন্ত্রণা তো আর চিকিৎসকের ডেট দেখে আসে না। কিন্তু অনেক রোগীর পরিবারের অভিযোগ, নিজের চাপ কমাতে কিছু চিকিৎসক ভরতি নিতে অস্বীকার করেন, কিছু হয়নি, দেরি আছে বলে ফিরিয়েও দেন, যার ফলে হাসপাতালের মধ্যে বা রাস্তাতেও অনেক সময় প্রসব হয়ে গিয়েছে— এ ঘটনাও বিভিন্ন দৈনিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত। এ ছাড়া নার্সিং হোম তো রয়েইছে। কিছু ক্ষেত্রে দালালচক্র সক্রিয় বলেও অভিযোগ। মাঝেমধ্যেই দেখা যায়, রোগীকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স চালকরা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। অনেক সময় নাকি সেই মেডিক্যাল কলেজ কোচবিহারের মধ্যেই কোনও একটা নার্সিং হোমে পাওয়া যায়। শহরের মানুষ অবশ্য এ-ও বলেন, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে এখানকার চিকিৎসকরা কেউ কর্মভীরু বা এঁদের জ্ঞান কিছু কম রয়েছে। এঁদের বেশির ভাগই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রোগী দেখেন নিজস্ব চেম্বারে। সাধারণ থেকে কঠিন, সব ধরনের রোগ সারান। রোগীরাও সুস্থ হয়ে মোটা ফিজ দিয়ে হাসি মুখে বাড়ি ফিরে যান। ডাক্তারবাবুদেরও খাটুনি সার্থক। শুধু হাসপাতালে ঢুকলেই এঁদের কর্মক্ষমতা ও জ্ঞানের আলো কোথায় যে মিলিয়ে যায়...

একই অঙ্গে নানা রূপ— এর আদর্শ উদাহরণ মিলবে এমজেএন হাসপাতালে এলে। এবং এখানকার সিসিইউ-তে প্রবেশ করলে। দু'বছর হল চালু হয়েছে সিসিইউ (ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট)। মাসকয়েক হল অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত সিসিইউ-র চেহারা দেখলে মনেই হয় না এর বাইরে কয়েক গজের মধ্যেই মেলে এমন দৃশ্য যা নরকের সমতুল্য। বর্তমানে সিসিইউ-তে রয়েছেন বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া নার্স ও চিকিৎসকরা। কিন্তু চিকিৎসকরা প্রায় কেউই বিশেষজ্ঞ নন। এখানে রোগীরা যেসব চিকিৎসকের আন্ডারে ভরতি থাকেন, তাঁদের দু'বেলা রাউন্ডে আসার কথা। অভিযোগ, একজন ছাড়া কলবুক না দিলে কেউ উপরে আসতে চান না। গত ডিসেম্বরে এখানে একজন রোগীর প্রাণসংশয় হয়েছিল এক চিকিৎসকের কর্তব্যের গাফিলতির কারণে।

বর্তমানে সিসিইউ-তে হার্টের রোগীদের সমস্তরকম দামি ওষুধ, ইঞ্জেকশন, স্যালাইন বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। কয়েক মাস হল চালু হয়েছে ভেন্টিলেটরও।

কিছুদিন আগেই এমজেএন হাসপাতালে ডিজিটাল এক্সরে মেশিন বসানো হয়েছে। আলট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান-সহ ডায়ালিসিস ইউনিটও এখন চালু অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু বন্ধ হয়ে আছে টেলিমেডিসিন বিভাগ। তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র এখানে টেলিমেডিসিনের বিভাগটি চালু করেছিলেন, কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মাত্র ছ'মাস চলার পর বিভাগটিই বন্ধ করে দেওয়া হয়। একইভাবে অজানা কারণে বন্ধ হয়ে আছে অঙ্কোলজি ডিপার্টমেন্ট। হাসপাতালে একজন অঙ্কোলজিস্ট রয়েছেন। ২০০৮ সালে বেশ ঘটা করে বিভাগটি চালু হয়। তখন সপ্তাহে তিন দিন এর আউটডোর হত। কেমোথেরাপির সুযোগ পেতেন দুস্থ রোগীরা। মেল-ফিমেল মেডিক্যাল মিলে দশটা বেড ছিল, ক্যানসার রোগী ভরতি হত। বর্তমানে সব বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। অঙ্কোলজিস্টকে দিয়ে করানো হচ্ছে ফিজিশিয়ানের কাজ।

সরকারের পক্ষ থেকে কোচবিহার সদর হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজ স্তরে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই উদ্যোগ অবশ্যই সাধু। এর ফলে কোচবিহারের মতো প্রান্তিক জেলায় সাধারণ মানুষ থেকে গরিব মানুষ সকলেই উন্নত পরিষেবা পাওয়ার কথা। তাঁদের আর হাড়ের জন্য পাটনা বা অন্য কিছু হলে দক্ষিণ ভারতের ট্রেন ধরতে হবে না। ঘটিবাটি বিক্রি করে মেটাতে হবে না নার্সিং হোম কিংবা বেসরকারি হাসপাতালের বিলও। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, সরকারি তরফ থেকে শুধুমাত্র উন্নত যন্ত্রপাতি, ওষুধ, টাকা দিলেই হবে না। চাই কাজ করার সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষ। ভাল পরিষেবা দেবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স-সহ বিভিন্ন বিভাগে যদি কর্মী না দেওয়া হয়, তবে মেডিক্যাল কলেজের এই উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। এ ছাড়াও প্রশাসনিক নজরদারিও জরুরি।

শাসক দলের জনৈক নেতাস্থানীয় ব্যক্তিকে হাসপাতালের এই হাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সদর্থক উত্তর মেলে, মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা রয়েছে কিন্তু তার যথাযোগ্য রূপায়ণে আমরা ব্যর্থ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি চোখ খোলা রেখে নিজের দায়িত্ব পালন করেন, তবেই সরকারের উদ্দেশ্য সার্থক হবে আর রোগীও অকারণ হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

‘সাহস থাকলে আমাকে কমিটিতে রাখুন তারপর বলুন উন্নয়নের খতিয়ান’

মুখোমুখি একান্তে
সুখবিলাস বর্মা

বিধায়ক, জলপাইগুড়ি

এখন ডুয়ার্স ঃ জোটের কারণে যারা সুফল লাভ করেছেন, আপনি তাঁদের একজন। এটা ঠিক তো?

সুখবিলাস ঃ জোট না হলে আমি এবার জলপাইগুড়ি সদর থেকে জিততাম না।

এখন ডুয়ার্স ঃ তবে জেলায় কেন একটাই জুটল?

সুখবিলাস ঃ আমার এলাকায় পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে ভয় দেখানোর কাজটায় ওরা সফল হয়নি। কারণ এখানে জোটের দুই শিবিরই শক্তিমান। আমি যে ওয়ার্ডে থাকি, সেখানেও কংগ্রেস না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছিল পুলিশ দিয়ে।

এখন ডুয়ার্স ঃ জোট কি এখনও সজীব ও সক্রিয়?

সুখবিলাস ঃ আমি বলব জোট প্রতিদিনই মজবুত হচ্ছে। ভোটের আগে জোট গঠন করতে হয়েছে মাত্র দুই সপ্তাহে। এতে শাসক দল ২১১টা পেলেও প্রায় সবখানেই ভোট হারিয়েছে। মণীশ গুপ্তের মতো লোক, এবং আরও কিছু হেভিওয়েট হেরেছে। সুব্রত মুখার্জির মতো নেতাও জিতেছেন কষ্ট করে। অথচ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দশ দিনও সময় পায়নি প্রচারের জন্য। এক কথায়, রাজ্যের সব জেলার মতো জলপাইগুড়িতেও জোট খুব মসৃণভাবেই এগচ্ছে।
তৃণমূল-পুলিশ-প্রশাসন-বিজেপি-র জোটের বিরুদ্ধে এছাড়া বিকল্প নেই।

এখন ডুয়ার্স ঃ কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের একটা অংশ বলছে বিধানসভার আগে এবং এখনও জোটের ক্ষেত্রে বামেরাই ছড়ি ঘোরাচ্ছে। জোটের মিটিং তাঁদের পার্টি অফিসেই করতে হয়। তাঁরা কংগ্রেসের পার্টি অফিসে আসেন না। ‘বাম গণতান্ত্রিক জোট’ থেকে ‘বাম’ শব্দটা বাদ দেওয়া হচ্ছে না।

সুখবিলাস ঃ বিধানসভার আগে জোটের কার্যক্রম নির্ধারণের দায়িত্ব আমার ওপরেই ছিল। আধিপত্যের প্রশ্নটা ঠিক নয়। শহরের বাইরে গ্রামে অনেক জায়গাতেই ভোটের আগে জোটের মিটিং কংগ্রেসের অফিসে হয়েছে। রাজীব ভবনে (জেলা কংগ্রেসের অফিস) হয়নি। ভবিষ্যতে হবে। এসব আলোচনায় মিটে যায়।

এখন ডুয়ার্স ঃ তবে শহরে জোটের জনসভায় কংগ্রেসী নেতৃত্ব সবাই হাজির থাকছেন কই? কেউ কেউ তো নিয়মিত অনুপস্থিত! মানসিক দূরত্ব?

সুখবিলাস ঃ এখনও অনেক সমর্থক থাকলেও কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী আর নেতা তো জেলায় খুব বেশি নেই। হ্যাঁ। মানসিক দূরত্ব একটা ফ্যাক্টর বটে। নীতিগত পার্থক্যের সমস্যাও একটা বিষয়। কিন্তু তাতা’র মতো (অমিত ভট্টাচার্য) তীব্র বাম বিরোধী কর্মীদেরও জোটে আনা গিয়েছে।

> ভাবতে পারেন এসজেডিএ-র কমিটিতে জলপাইগুড়ির সদর বিধায়ক নেই, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নেই?

এখন ডুয়ার্স ঃ বামেদের ৩৪ বছরটা গত ৫ বছরের তুলনায় ভাল— এটা কি কংগ্রেসীরা মানতে পারছে?

সুখবিলাস ঃ পারছে। কারণ এই সরকার ‘আইন’ ব্যাপারটাকেই মানে না। পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে ওদের জোট। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ব্যাপারটা আইন অনুযায়ী হয় না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে হয়েছে তাই বানিয়ে ফেলেছেন। উনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন। আইন-বিধি-নিয়ম— এসব মূল্যহীন ওনার সরকারের কাছে। এরপরে আছে রাশি রাশি মিথ্যে কথা বলা।

ভোট অনেক কমে গিয়েছে ওদের মাত্র কয়েক দিনের জোটে। মুখ্যমন্ত্রীর মার্জিনও। পরের যুদ্ধ পঞ্চায়েত। আমি তো কাজ শুরু করে দিয়েছি।

ছ'-কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা খরচ করে চল্লিশ লক্ষ সাইকেল দিয়েছে বলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের আগে। সাইকেল পিছু খরচ ৩২০০ টাকা। ভাগ করে দেখুন। সাইকেল কটা হচ্ছে? সেদিন আবার বললেন, পঁচিশ লক্ষ। আরও কমে যাবে। সরকারের মিথ্যেগুলো নিয়ে বিধানসভায় আমিই সব চাইতে বেশি বলি। তথ্য-প্রমাণ দিয়ে। এই সরকার গোঁজামিলের মাস্টার। সেদিন বিধানসভায় আমি বলেছি 'গোঁজামিল দাদা'। এটা শুনে শুভেন্দু (অধিকারী) রে রে করে উঠেছিলেন। কিন্তু 'গোঁজামিল' মেলেনি। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলে গেলেন 'করে দিয়েছি'। আরেকটা মিথ্যে।

এখন ডুয়ার্স ঃ সার্কিট বেঞ্চ তো বাম আমলেও হয়ে ওঠেনি।

সুখবিলাস ঃ বেঞ্চ শিলিগুড়ি না জলপাইগুড়িতে হবে, সে সিদ্ধান্তে আসতেই ওই আমলের অনেকটা সময় গিয়েছে। এ বাংলাতে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। মানছি যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পরিবর্তন হলে প্রক্রিয়াটা বিলম্বিত হয়। কিন্তু সার্কিট বেঞ্চের ব্যাপারে এই সরকারের কী অবদান? এমন হাজারো মিথ্যের কারণেই জোট মজবুত হচ্ছে।

এখন ডুয়ার্স ঃ হাওয়ার বিরুদ্ধে জিতলেন। কী করতে চাইছেন এলাকার জন্য?

সুখবিলাস ঃ দেখুন। এই সরকারের বৈশিষ্ট্য হল কমিটিতে বিরোধীদের না রাখা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ, এসজেডিএ ইত্যাদি কোনও কমিটিতেই আমি গত পাঁচ বছরে স্থান পাইনি। তৃণমূল ছাড়া ওসব কমিটিতে কেউ থাকে না। বিধানসভায় বেশি প্রতিবাদ করি বলে সুখবিলাস বর্মার নাম দেখলেই সরকার সবার আগে কেটে দেয়। ভাবতে পারেন এসজেডিএ-র কমিটিতে জলপাইগুড়ির সদর বিধায়ক নেই, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নেই? আমার ভরসা বলতে বিধায়কের এলাকা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ তহবিলের টাকা। তার পাই পয়সা গত টার্মে খরচ করে হিসাব দিয়েছি। এবারেও তাই করব।

এখন ডুয়ার্স ঃ উত্তরের কথা কি বিধানসভায় প্রতিফলিত হবে আপনার মাধ্যমে?

সুখবিলাস ঃ সংবিধান, আইন, বিধানসভা ইত্যাদি শব্দগুলির মর্যাদা না থাকলে কোনও মতই প্রতিফলিত হবে না। বললাম যে, শাসক দল এসবের তোয়াক্কাই করে না। তবে আমি বলে যাব। আমার হাতে যা তথ্য প্রমাণ থাকে তা সরকারের পছন্দ হয় না। ওদের উন্নয়নের গল্প আটকে যায়। মানুষও এসব বুঝতে পারবেন। পারছেনও।

এখন ডুয়ার্স ঃ জোটের কথায় আবার আসছি। জলপাইগুড়িতে কি সত্যিই কংগ্রেসীরা মন থেকে জোট মেনে নিয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস?

সুখবিলাস ঃ এবারের ভোটে আমাকে হারাবার জন্য আমার দলের কে কে শহরে টাকা খরচ করেছেন বা করিয়েছেন, তা আমি জানি। নীতিগত কারণে কেউ কেউ সাড়া না দিতেই পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্য 'নীতি'কে অজুহাত করার ব্যাপারটাও ঘটছে। জোট ভাঙলে কার লাভ? তৃণমূল আর বিজেপি-র। যাঁরা নীতির প্রশ্নে আটকে যাচ্ছেন, তাঁরা ক্রমশ পরিস্থিতি অনুভব করতে পারবেন বলে বিশ্বাস। কিন্তু নিজের আখের গোছানোর জন্য 'নীতি'র কথা তুলে জোট বিরোধিতার বিষয়টিকে আমরা মূল্য দিচ্ছি না। জেলায় দল ছেড়ে তৃণমূলে কারা গিয়েছে? যাদের গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পিঠ বাঁচাতে গিয়েছে সব। আর টাকা কামাতে। পিঠ বাঁচানোর জন্য, কামানোর জন্য কংগ্রেসে থেকেও জোটের বিরোধিতা করা যায়। এসবও ঘটছে। কিন্তু এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমি আলোচনায় বিশ্বাসী। জোটে বিশ্বাসী।

এখন ডুয়ার্স ঃ এসজেডিএ বলছে তারা বাম আমলের তুলনায় জলপাইগুড়িতে অনেক বেশি কাজ করেছে।

সুখবিলাস ঃ হ্যাঁ। কাজ বলতে শ্মশান বানিয়ে টাকা লুঠ। একজন আমলাকে বলির পাঁঠা করা। আর চার টাকার কাজে চার লক্ষ টাকা খরচ দেখানো। সাহস থাকলে এসজেডিএ-র কমিটিতে আমাকে রাখুন। বিরোধীদের রাখুক। তারপর বলুক তো কত উন্নতি করেছে। উন্নতির বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে কাগজে। বাস্তবে অন্য কাহিনি।

এখন ডুয়ার্স ঃ তবে জোটই কি ভবিষ্যৎ?

সুখবিলাস ঃ এ নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। বললাম না। ভোট অনেক কমে গিয়েছে ওদের মাত্র কয়েক দিনের জোটে। মুখ্যমন্ত্রীর মার্জিনও। পরের যুদ্ধ পঞ্চায়েত। আমি তো কাজ শুরু করে দিয়েছি। প্রথম মিটিং বৃষ্টির কারণে বাতিল করতে হয়েছে। সেটা আজ হবে। আর শাসক দল ভালমতই জানে যে জোট বজায় থাকলে পঞ্চায়েতে অনেক দুঃখ আছে। তাই পুলিশ-প্রশাসন আর বিজেপিকে নিয়ে নেমে পড়েছে। ডুয়ার্সে বিজেপির উত্থান তো ওদের সৃষ্টি। খড়্গপুরের মতো।

এখন ডুয়ার্স ঃ ডুয়ার্সের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রচারে আপনি কিছু ভাবছেন?

সুখবিলাস ঃ (একটু চুপ করে থেকে) ভাওয়াইয়া গানকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমাকেই পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেই গানের ক্ষেত্রে আমি কিছু করতে চাইলেও সরকার ডাকবে না। ব্যক্তিগতভাবে তাই এই নিয়ে প্রবন্ধ লিখি, গাই, আলোচনা করি।

ভাওয়াইয়া গানকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমি কিছু করতে চাইলেও সরকার ডাকবে না।

এখন ডুয়ার্স ঃ আপনার মতো বিদগ্ধ মানুষ পেয়ে বিধানসভার লাভ হল কিছু?

সুখবিলাস ঃ (হাসি) নিয়ম মতো বিধানসভাই তো রাজ্য শাসনের গোড়ার কথা। আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু এ রাজ্যে সিদ্ধান্ত তো একজনই নিয়ে থাকেন।

এখন ডুয়ার্স ঃ ধন্যবাদ আপনাকে।

সুখবিলাস ঃ আমার কলকাতার ঠিকানায় 'এখন ডুয়ার্স' নিয়মিত পাই। আমি পড়ি। ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার— ডুয়ার্স ব্যুরো

দক্ষিণ দিনাজপুরের ঘরের মেয়ে হয়ে গেছেন অর্পিতা ঘোষ

থিয়েটার সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা ভালো মতোই জানেন অর্পিতা ঘোষের সাংস্কৃতিক পরিচয়। মঞ্চের দাপুটে অভিনেত্রী, কলকাতার প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'পঞ্চম বৈদিক'-এর বর্তমান নাট্য নির্দেশক, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শাঁওলী মিত্রর স্নেহধন্যা— এই পরিচয় সুবিদিত। 'স্ত্রীর পত্র' কিংবা 'অচলায়তন'-এ যাঁর অভিনয় বালুরঘাটবাসীর চোখে লেগে আছে।

কাট টু ২০১৪

ভারতবর্ষের আরেকটি লোকসভা নির্বাচনের ব্যস্ততা তখন তুঙ্গে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ঘুঁটি সাজাচ্ছে, প্রার্থী বাছাই পর্ব চালাচ্ছে। বামপন্থী দল আগেই তাদের প্রার্থী নির্বাচন করেছে। কংগ্রেস আর বিজেপি-ও সেই পথ ধরে হেঁটেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তখনও প্রার্থীর খোঁজ চলছে, চালাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রপত্রিকায়, চ্যানেলে চ্যানেলে স্থানীয়, বহিরাগত প্রার্থী— এসব নিয়ে জোর আলোচনা। জেলার

আকাশে-বাতাসে তখন বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন সম্ভাবনা। কেউ কেউ বলছেন, স্থানীয় প্রার্থী হওয়াই ভাল অর্থাৎ প্রার্থী জেলার বাসিন্দা হলেই ভাল। কেউ কেউ আবার বলছেন, স্থানীয় কিংবা বহিরাগত প্রার্থী ফ্যাক্টর নয়, আসল হচ্ছে ব্যক্তি। তাঁর কাজের সদিচ্ছা আছে কি না, সেটাই আসল। এসব নিয়ে চর্চা যখন জোরকদমে, তখনই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, বালুরঘাট নাটকের শহর। ওখান থেকে লোকসভা ভোটে প্রার্থী হবেন নাট্যকর্মী অর্পিতা ঘোষ।

তারপর?

তারপর আর কী! কোমর বেঁধে নেমে পড়া। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তখন জোরদার প্রচার চালাচ্ছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন বহিরাগত প্রার্থীর তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে, তখন তৃণমূল কংগ্রেস তাদের নিজেদের মতো করে প্রচার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করল। জেলা জুড়ে প্রচারের পাশাপাশি নতুন প্রার্থী অর্পিতা ঘোষকে জেলার মানুষের কাছে পরিচয় করানোর পর্ব চলতে লাগল একদিকে, আবার অপর দিকে অর্পিতা ঘোষের সমর্থনে তাঁর কলকাতার নাট্যবন্ধুরা বালুরঘাটের বিভিন্ন জায়গায় সভা করছেন। মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসু, সুবোধ সরকার, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, অনীশ ঘোষরা তখন অর্পিতা ঘোষের হয়ে

গলা ফাটাচ্ছেন। ফল, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষের জয়। জেলার আকাশে উড়ল সবুজ আবির। কলকাতা থেকে আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুরাও এসেছিলেন জয়ের আনন্দে শরিক হতে। রাজ্যের শাসকদলের জেলার বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছিলেন তখন অর্পিতা ঘোষকে জেতানোর জন্য। আর অর্পিতা ঘোষ নিজেও অচেনা জায়গাকে ক্রমশ চিনতে, নিজের করে নিতে পরিশ্রমে ও আন্তরিকতায় কোনও ত্রুটি রাখেননি।

এর পর উন্নয়নের কাজ

'মানুষ যখন জিতিয়েই দিলেন, তখন মানুষের প্রতি তো দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবেই। করতে হবে মানুষের কাজ। প্রিয় দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। দিদি যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।' বললেন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ। নাটক, নাট্যরূপ, নির্দেশনা, অভিনয়, মঞ্চ— এইসব পরিচিত শব্দর মাঝে ঢুকে পড়ল রাস্তাঘাট, পরিকাঠামো, উন্নয়ন, অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন, জেলার অগ্রগতি, সরকারি অনুষ্ঠান, উদ্‌বোধন, শিলান্যাসের মতো বিষয়গুলি। এমপি ল্যাডের টাকা সম্পূর্ণ খরচ করার ব্যাপারে নজির তৈরি করলেন।

আগে দেখা যেত, সাংসদ কোটার টাকা খরচ করা যাচ্ছে না, পড়ে রয়েছে। পরে ফিরে যাচ্ছে। সাংসদ অর্পিতা ঘোষই প্রথম দেখালেন যে, ইচ্ছে থাকলে সাংসদ কোটার টাকা শেষ করা যায়। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানালেন, 'এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, সাংসদ কোটার টাকা দেওয়া হয় কাজ করার জন্য। সম্পূর্ণ টাকা দিয়েই তো মানুষের কাজ করতে হবে। নইলে পরের অ্যালটমেন্ট পাব কী করে? তবে এ ব্যাপারে আমি আমার জেলার জেলাশাসক তাপস চৌধুরী ও ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং অফিসারের কথা বলব। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব হত না।'

চলে এল নির্বাচন

এই করতে করতেই চলে এল নির্বাচন। ২০১১ সালে যে মানুষের বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছিল, ২০১৬-তেও সেটাই থাকবে, নাকি আবার পরিবর্তন হবে? সমগ্র রাজ্য জুড়ে যে জোট হয়েছে, তার প্রভাব কি ভোটে পড়বে? কী হবে দক্ষিণ দিনাজপুরে? ৬টি আসনের মধ্যে গতবার তৃণমূলের পক্ষে ফল ছিল ৫-১। এবারও কি তা-ই হবে? নাকি শাসকদলের পক্ষে ৬-০ হবে? নাকি পুরোটাই উলটে যাবে? কারণ, গত পাঁচ বছরে একটু একটু করে ক্রমশ প্রকট হয়েছে তৃণমূলের দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রথম দিকে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শংকর চক্রবর্তী ও পরিষদীয় সচিব বিপ্লব মিত্রর গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধিতা ছিল বলে শোনা যায়। পরের দিকে বিপ্লব মিত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য বিধায়কদেরও মতপার্থক্য, তাকে ঘিরে দলীয় কোন্দল— এসব সামনে এল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এমনটাই বলে থাকেন। এদিকে ভোটের বৈতরণি পার করতে হবে। বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী উন্নয়ন করেছেন আক্ষরিক অর্থেই। তিনি জিতবেন? নাকি তাঁর বিপরীতে ভোটে দাঁড়ানো জোটপ্রার্থী পোড়খাওয়া রাজনৈতিক নেতা প্রাক্তন কারা মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী জিতবেন? অভিযোগ, বিপ্লব মিত্রর গোষ্ঠীর বিভিন্ন তৃণমূল কর্মী, যাদের বাড়ি এবং কর্মস্থল বালুরঘাট বিধানসভা এলাকা, তারা নাকি বালুরঘাট বিধানসভা প্রার্থী তথা নতুন জেলা সভাপতি শংকর চক্রবর্তীকে ভোটে জেতানোর জন্য কাজ করছে না।

অপর দিকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি নিষ্ক্রিয় কর্মীদের ভোটের কাজে লাগার জন্য ডাক দিচ্ছেন না— এমনটাই অভিযোগ। এই যখন অবস্থা, তখন দেখা গেল, অর্পিতা ঘোষ বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করছেন, আর বিভিন্ন নেতা-কর্মীর মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করছেন। ফোনে ফোনে নির্দেশ দিচ্ছেন। নিষ্ক্রিয় কর্মীদের ভোটে নামার কথা বলছেন। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটানোর চেষ্টা করছেন। আর জেলা জুড়ে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখছেন। প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। কে বলবে তাঁর বাড়ি কলকাতাতে? মাত্র দু'বছর আগেও রাজনীতি তাঁর কাছে ছিল অচেনা বিষয়। আসলে তিনি যে ততদিনে এ জেলার মেয়ে হয়ে উঠেছেন— এ জেলা যে তখন তাঁর নিজের ভাষায়, 'আমার জেলা'। এ সময়ই ঘটল সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রচার শেষে ফেরার পথে পথদুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হলেন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি যেতে হল কলকাতাতে। একেবারে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার, হয়েই গেল।

কী হল নির্বাচনে?

সমগ্র রাজ্যে যখন বর্তমান শাসকদলের জয়ধ্বজা উড়ল, তখন দক্ষিণ দিনাজপুরে উলটো। শাসকদলের মাত্র দুটো আসন। বিরোধী গণতান্ত্রিক জোটের চারটি। হেরে গেলেন পূর্তমন্ত্রী তথা তৃণমূল জেলা

তৃণমূলের জেলা সভাপতি নিষ্ক্রিয় কর্মীদের ভোটের কাজে লাগার জন্য ডাক দিচ্ছেন না— এমনটাই অভিযোগ। এই যখন অবস্থা, তখন দেখা গেল, অর্পিতা ঘোষ বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করছেন, আর বিভিন্ন নেতা-কর্মীর মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করছেন। ফোনে ফোনে নির্দেশ দিচ্ছেন। নিষ্ক্রিয় কর্মীদের ভোটে নামার কথা বলছেন। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটানোর চেষ্টা করছেন। আর জেলা জুড়ে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখছেন।

সভাপতি শংকর চক্রবর্তী এবং প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিপ্লব মিত্রও। শুধু গতবারের বিধায়ক বাচ্চু হাঁসদা এবং কুমারগঞ্জের নতুন প্রার্থী তোরাক হোসেন মণ্ডল জয়লাভ করলেন। বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের ভোটবিপর্যয় নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে চায়ের দোকানে, রাস্তার মোড়ে, অফিসকাছারিতে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ওই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যদি অর্পিতা ঘোষের পথদুর্ঘটনা না ঘটত তাহলে ফলটা এমন হত না বা এতটা খারাপ হত না। কারণ, সাংসদ অর্পিতা ঘোষ ক্রমশ সবটা গুছিয়েই নিয়েছিলেন। শোনা যায়, বিষয়টি নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আপশোস করেছেন, 'ইশ্, অর্পিতার যদি অ্যাক্সিডেন্টটা না হত!'

কী বলছেন অর্পিতা নিজে?

ভোটের আগে বারবার বিভিন্ন সভায় একযোগে কাজ করার কথা বলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো, তৃণমূলের মহাসচিব। তবুও ঐক্যবদ্ধভাবে চলা গেল না কেন? কলকাতা থেকে ফোনে অর্পিতা ঘোষ জানালেন, 'দেখুন, আমি পিছনে তাকাতে ভালবাসি না। যা হয়েছে, হয়ে গিয়েছে। যদি কোনও সমস্যা থাকে তা মিটে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। হ্যাঁ, আমার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে মমতাদিও ভীষণ আপশোস করেছিলেন। আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের দোতলায় আর্ট গ্যালারি তৈরির কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে তপন কেন্দ্রের বিধায়ক ও মন্ত্রী বাচ্চু হাঁসদা, জেলাশাসক তাপস চৌধুরী ও পুলিশ সুপার অনির্বান ঘোষ।

মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের মাথার উপর দলনেত্রী আছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর তাঁর খুব কাছের। ফলে অসুবিধা হবে না। সব সমস্যা মিটে গিয়ে নতুনভাবে আমরা আবার একসঙ্গে পথ চলব।'

নতুন কাজ, নতুন স্বপ্ন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাব আর্ট গ্যালারির জন্য আবেদন করেছিল। সত্যিই এটা ভাল উদ্যোগ। আমি সাংসদ কোটার প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম নাট্য উৎকর্ষকেন্দ্র বালুরঘাটে হচ্ছে। ব্ল্যাক বক্স থিয়েটার হবে। বিশেষজ্ঞ মানুষদের আমি দিল্লি ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামাতে পাঠিয়েছি। থিয়েটারে আমার অগ্রজদের সহযোগিতায় বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব, যেমন— শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, শিশির ভাদুড়ি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখর ছবি ও কার্যবিবরণী দিয়ে বাংলা নাটকের ইতিহাস ও তার বিবর্তনকে ধরার চেষ্টা করছি। এ ব্যাপারে পঞ্চম বৈদিক-এর কর্ণধার শাঁওলী মিত্রর সঙ্গে কথাও বলেছি। আর্কাইভ তৈরি করব এখানে। থাকবে আরও অনেক কিছু। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ইতিমধ্যেই কিছু করেছি। কিছু ভাবনা আছে। ইতিমধ্যেই বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দপ্তর প্রতিমন্ত্রী বাচ্চু হাঁসদার সঙ্গে কথা বলেছি। উন্নয়নের কাজ চলতেই থাকবে। আর স্বপ্ন, আমার জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে 'ইতিহাস পর্যটন'কে প্রোমোট করা। দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন কোণেই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে পর্যটনের স্বপ্ন দেখছি। এ ব্যাপারে নতুন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবের সঙ্গে কথাও হয়েছে।

আর ঘরের মেয়ে

সত্যি বলতে কী, মমতাদি যখন দক্ষিণ দিনাজপুরের জন্য আমার নাম বিবেচনা করলেন, তখন দারুণ আনন্দ পেয়েছি। বালুরঘাট সংস্কৃতির শহর। দক্ষিণ দিনাজপুর সংস্কৃতির জেলা। এ জেলার মানুষ ভীষণভাবে আক্ষরিক অর্থেই সংস্কৃতিবান, আন্তরিক। আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে আপন করে নিয়েছে। আমিও নিয়েছি। এই জেলা তাই আমার জেলা। আমি ঘরের মেয়ে। সুনির্মল আছে, আপনারা আছেন। আমি খুব খুশি আমার নতুন পরিচয়ে।

সবুজ মিত্র ও মৃদুল হোড়

নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাথাভাঙা পৌরসভা

সুটুঙ্গা ও মানসাই নদীর বাঁধ বরাবর পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে

মাথাভাঙা মাছ বাজার পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে

মাথাভাঙা চৌপথীতে দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলছে

মাথাভাঙা ইমিগ্রেশন রোডে দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ চলছে

মাথাভাঙা পৌরসভার নতুন কিছু প্রকল্প

- মাথাভাঙা মাছবাজারের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায়। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।
- হাইড্রেন প্রকল্পে ৮ নং ওয়ার্ডে শিবশংকর সা-এর বাড়ি (মনমোহন পাড়া) থেকে শুরু হয়ে কেষ্ট সাহার বাড়ি পর্যন্ত ২৬৫ মিটার লম্বা (চওড়া ৪ মিটার) হাইড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে পূর্ণ গতিতে। খরচ হবে ২২ লক্ষ টাকা।
- রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা প্রকল্প থেকে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য কমপ্যাক্টর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৯ নম্বর ওয়ার্ডে (কলেজ মোড়) একটি ম্যারেজ হল নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক আরও জানিয়েছেন—

শহরের নিকাশী ব্যবস্থা সংস্কারে রাজ্য সরকারের তরফে দেড় কোটি টাকার অনুদানে নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার চলছে।

আশুতোষ হলের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ১৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। কাজ চলছে।

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তালিকা—

- নদীর জল থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা দূর হবে। বাঁধ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে বাঁধ বরাবর প্রায় ৩ কিমি পাকা রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুলের বাগান, বাতিস্তম্ভ হবে। ১ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি বন দপ্তরের পার্ক হবে।
- চৌপথি ও শনি মন্দির এলাকায় দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের টেন্ডার সম্পন্ন।
- মালিবাগানে পুকুর সংস্কার করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- কলেজ মোড়ে দুটি অথিতিশালা নির্মাণের কাজ চলছে।
- বিগত বোর্ডের কারণে এই পৌরসভার দায়ে থাকা প্রায় ২ কোটি টাকার ঋণ মেটানোর চেষ্টা চলছে। পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা মেটাতে তিনটি নতুন পাম্প চালু করার চেষ্টা চলছে।
- শহরে কনফারেন্স হল ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চন্দন কুমার দাস,
ভাইস চেয়ারম্যান

লক্ষপতি প্রামাণিক,
চেয়ারম্যান

মাথাভাঙা পৌরসভা

দেবপ্রসাদ রায়

এমএলএ হস্টেল থেকে পার্শ্ববাবুর মেস হয়ে লেখক এখন কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট পেয়েছেন থাকার জন্য। রাজ্যে দলের সরকার। সিদ্ধার্থবাবু মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ না-পাওয়া দেবপ্রসাদ দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হচ্ছেন। ছাত্র পরিষদের কর্মী হিসেবে এবার তাঁর বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার পালা। এর মধ্যেই ঘনিয়ে এসেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সে প্রেক্ষিতে রাজ্যে পালাবদলের কাহিনির আরেক দিক এবার উন্মোচিত হচ্ছে এই ধারাবাহিকে। যে সময়কে সন্ত্রাসের কাল হিসেবে এক পক্ষ যে একতরফা দাবি করে আসছিল, পর্বে পর্বে এবার বেরিয়ে আসছে সে দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন। থাকছে ডানপন্থী রাজনীতির বহু অজানা কাহিনি।

১৪

১৯৭২ থেকে '৭৭— এই সময়টার অধিকাংশই কেটেছে যুব কংগ্রেসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যা ঘটেছিল, সেটা এবার বলি। ১৯৭৩ সালে একদিন পি এন ত্রিপাঠী নামক এক ভদ্রলোক আমাকে প্রস্তাব দিলেন যে, আমি যেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কর্মী ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করি। ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যে আমি খুব একটা জড়িত ছিলাম, এমন নয়। প্রিয়দার এক ভক্ত ছিলেন বড়বাজারের হৃদয়ানন্দ গুপ্তা। তিনি মুটে-মজদুর-রিকশাওয়ালাদের ইউনিয়ন পরিচালনা করতেন এবং সেসব ইউনিয়নে 'সহসভাপতি' কিংবা 'কার্যকরী সভাপতি' ইত্যাদি অভিধায় আমাকে জুড়ে দিতেন। হৃদয়ানন্দ গুপ্তার সঙ্গে আমিও যোগাযোগ রাখতাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন কারণে। উনি ফি-বছর পুজোয় আমাকে জামাকাপড় উপহার দিতেন!

ত্রিপাঠীকে আমার কথা হৃদয়ানন্দই বলেছিল। আমি তাঁকে জানালাম যে, ইউনিয়নের ব্যাপারে আমি তেমন কিছু করি না। কেবল নামেই থাকি। ত্রিপাঠী বললেন, 'সেইভাবেই থাকবেন।' সুতরাং আমি রাজি হলাম। কিন্তু ইউনিয়নের মিটিং-এ গিয়ে দেখলাম সদস্যসংখ্যা মোটে ৩৮, অথচ তখন গ্রেট ইস্টার্নের কর্মীসংখ্যা ৯৪২! আটত্রিশজন বাদে বাকি সবাই জগন্নাথ পান্ডের ইউনিয়ন করে। মালিকপক্ষের সঙ্গে সে ইউনিয়নের বেশ দহরম মহরম এবং যে আটত্রিশজন সে ইউনিয়নের সদস্য না হয়ে ত্রিপাঠীর ইউনিয়নে আছে, তাদের প্রত্যেককে অন্যায়ভাবে হোটেল কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করেছিল। বরখাস্ত কর্মীরা আদালতে গিয়ে মামলায় জিতলেও পান্ডেদের ইউনিয়ন তাদের হোটেলে ঢুকতে দিচ্ছিল না।

বুঝলাম যে, ত্রিপাঠীর ইউনিয়নের সভাপতি হয়ে আবার একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছি। গ্রেট ইস্টার্নের কথায় পরে আসছি। তার আগে কিছু অন্য কথা বলি।

শৈশবে অথবা কৈশোরে যে আমার কলকাতায় যাওয়ার অবকাশ হয়নি, সে কথা আগেই বলেছি। কলকাতায় প্রথম গিয়েছিলাম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরে। বড়িশায় আমার দূর সম্পর্কের দাদারা থাকতেন। আমি সেখানে গিয়ে বড়িশাকেই ভেবেছিলাম কলকাতা। একা একা কলকাতায় প্রথম যাই সম্ভবত ছাত্র পরিষদের দায়িত্ব পাওয়ার পরে, ১৯৭০-এ। তখন মহাজাতি সদনে ছিল ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। মনে আছে যে, আমি সেখানেই দু'-তিন দিন রাত্রিবাস করেছিলাম সেবার। তখন শঙ্কর ভট্টাচার্য বলে ছাত্র পরিষদের একজন সর্বক্ষণের কর্মী থাকতেন সেখানে। শংকরদা পরে কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরিতে চলে যান।

মহাজাতি সদনে রাতে ঘুমাবার জন্য ছিল শতরঞ্চি আর টেলিফোন ডিরেক্টরি। দ্বিতীয়টা বালিশের কাজ করত। খাওয়ার ব্যাপারটা সারতাম মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের একটা উড়িয়া হোটেলে। পরে যে হ্যারিসন স্ট্রিটের একটা মেসে থাকতে শুরু করেছিলাম, তা আগেই বলেছি। বস্তুত, কলকাতার জীবনে আমি যখন সড়গড় হতে শুরু করেছি, তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভায় আমি মহাজাতি সদনে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলাম। আমি বেশ সরল মনে, যা বলা উচিত তা বলার জন্য, খোলাখুলি বক্তব্য রাখলাম একটা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে, আমার বক্তব্য নেতৃত্বকে আঘাত করছে। আসলে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব যে তখন দ্বিধাবিভক্ত, সে ধারণাও ছিল না আমার। আসলে রাজ্য রাজনীতি বিষয়ে স্বচ্ছ কোনও ধারণাই তৈরি হয়নি আমার মনে।

ফলে জবাবি ভাষণে ছাত্র পরিষদের তৎকালীন রাজ্য সভাপতি সুব্রতদাকে বেশ ক্ষিপ্ত দেখাল। তাঁর বক্তব্য শুনে আমি বেশ টের পেলাম যে, কিছু গণ্ডগোল করে ফেলেছি। কিন্তু গলদটা কোথায় তা ধরতে পারছিলাম না। আমি বক্তৃতায় কাউকে আঘাত করে কিংবা কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কিছু বলিনি। সাধারণ কিছু সমস্যা আর অসুবিধার কথাই তুলে ধরেছিলাম।

সুব্রতদা অবশ্য পরে বুঝেছিলেন যে, আমার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সে দিন তাঁর আক্রমণাত্মক ভাষণের কারণে আমি যখন বেশ অসহায় বোধ করছিলাম, তখন একটি ছেলে এগিয়ে এসে আমায়

ভরসা জুগিয়েছিল। তার নাম তমাল দে। মুর্শিদাবাদে ছাত্র পরিষদকে নেতৃত্ব দিত সে। তমাল নিজে এগিয়ে এসে আমাকে বলেছিল, 'তুমি কোনও ভুল বলোনি। তোমাকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। মন খারাপ কোরো না।'

এর পর সন্ধেবেলায়, সভার শেষে জয়ন্তকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন সুব্রতদা। আমি যেতেই অনুতাপের সুরে বললেন, 'আমার উপায় ছিল না। তোমার বক্তব্যকে খোরাক বানিয়ে একটা গোষ্ঠী আক্রমণ শানাতে পারে। তাই আক্রমণ না করে আমার উপায় ছিল না।'

বুঝতে পারলাম যে, জলপাইগুড়িতে খগেনবাবু আর রবিবাবুর দ্বন্দ্বে কংগ্রেসের গোষ্ঠী রাজনীতির যে ছায়া দেখতাম, তা ছাত্র রাজনীতিতেও প্রবেশ করেছে। গোষ্ঠী রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ আবার পেলাম মাত্র।

আসলে সেই সময়কালটাই আমার কাছে স্মরণীয়। একদিকে নকশাল রাজনীতির উদয়, মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, পরীক্ষাব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, যুক্তফ্রন্টের উত্থান-পতন— এসব তো ছিলই; অন্য দিকে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা। এই যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধির অসীম সাহস আর তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক চালের কারণে বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান অনেকটা উন্নত হয়েছিল। একদিকে তিনি যেমন এক কোটি শরণার্থীকে মাসের পর মাস অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান জুগিয়েছেন, তেমনই টানা দশ মাস বিশ্বের কোনায় কোনায় গিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের বুঝিয়েছেন যে, কেন মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে ভারত দাঁড়াতে চায়। দেশের কলাইকুন্ডা বিমানঘাঁটিতে পাকিস্তানের হানার জবাবে তিনি ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর ওই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার দশ দিনের মাথায় সে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। নিয়াজির কাছে সাতাশি হাজার পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে।

ফলে আমাদের কাছে সে সময়টা ছিল দারুণ উত্তেজনা আর আবেগের সময়! আমরা অনেকেই তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম যে, দুই বাংলা আবার এক হয়ে যাবে। সরকারিভাবে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণার আগে দশ মাস কম লড়াই তো হয়নি। পরে জেনেছিলাম যে, সে দিনগুলিতে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে বাঘা সিদ্দিকির নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা টানা যুদ্ধ চালিয়েছিল। রাজশাহি, পাবনা প্রভৃতি অর্থাৎ আমাদের সীমান্তের কাছাকাছি জায়গাগুলিতে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ জুগিয়ে আসছিল বিএসএফ। তারা কখনও মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে, আবার কখনও বিএসএফ হিসেবেই সীমান্তের ওপারে সাহায্য পাঠাত। আমাদের দায়িত্ব ছিল শিবিরগুলি থেকে খুঁজে খুঁজে শক্তসমর্থ ছেলেদের নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে ভরতি করানো। বিএসএফ সেই ছেলেদের ট্রেনিং দিত। তবে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, শিবিরের যোগ্য লোকেরা স্বেচ্ছায় মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিত। এমন অনেকবার হয়েছে যে, আমরা শিবিরে গিয়েছি, আর সেখানকার সমর্থ ছেলেরা সব আমাদের দেখে আগেই লুকিয়ে পড়েছে।

কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় দ্রুত পরিবর্তন এসেছিল, যেটা সমাপ্ত হল ১৯৭২-এ সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কংগ্রেস পেয়েছিল ২১৮টি আসন। আগেই বলেছি, তখন আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম যে, ইউরোপিয়ান দেশগুলোর মতো আমরা আর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিক কিছু বিভাজন রেখে প্রায় একটা দেশের মতোই বসবাস করতে পারব। দুই দেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াত হবে। দুর্ভাগ্য যে, কয়েকদিন পরেই মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হল এবং বাংলাদেশ চলে গেল সামরিক শাসনের অধীনে। স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না।

রাজ্যে তখন আক্ষরিক অর্থে 'শুধুই কংগ্রেস'। বামপন্থীরা পেয়েছিল ১৪টা আসন। বরানগর থেকে দাঁড়িয়ে জ্যোতিবাবুও পরাজিত। অবশ্য বামপন্থীরা বিধানসভা বয়কট করতে দেরি করেননি। তাঁদের যুক্তি ছিল, 'কারচুপিতে ভরা নির্বাচন। এ রায় আমরা মানি না।' আসলে ২১৮টি বিধায়কের পাশাপাশি সিপিআই-ও ছিল আমাদের জোটসঙ্গী। ফলে ১৪ জন বিধায়ক নিয়ে বাকি বামপন্থীদের কাছে 'বয়কট' ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তখন। অতঃপর কালচিনির আরএসপি বিধায়ককে বিরোধী দলনেতা করে বিধানসভার মর্যাদা রক্ষা করতে হয়েছিল সে যাত্রা।

কিন্তু কংগ্রেসের কঠিন সময়ে আগের বার যে ১০৫ জন জিতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন এই নির্বাচনে টিকিট পাননি। এঁরা ছিলেন আমাদের পীযূষদা, ভগবান সিং আর শিয়ালদা কেন্দ্রের বিনয় ব্যানার্জি। পীযূষদা বাদ গেলেন, কারণ মানুদা চাননি। ভগবান সিং কোনও অজ্ঞাত পারিবারিক কারণে বাদ গেলেন, এবং বিনয় ব্যানার্জি বাদ গেলেন, কারণ প্রিয়দা ওই আসনে সোমেন মিত্রকে আনতে চাইলেন।

তখন একবার বুঝেছিলাম যে, রসিকতা কত নিষ্ঠুর হতে পারে। শিয়ালদা আসনের আরেক দাবিদার ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ধীরেন বসু। সোমেনদা একদিকে প্রিয়দার কাছ থেকে খবর নিচ্ছেন যে, শিয়ালদা আসন পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা বাড়ছে, আর আরেক দিকে ধীরেনদাকে বলে যাচ্ছেন, 'আপনার শিয়ালদা প্রায় পাকা হয়ে এল।' অদৃষ্টের পরিহাসে ধীরেনদার বাড়িতে বসেই সোমেনদা পেলেন প্রিয়দার ফোন। সোমেনদার নাম চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তখন ফোনের রিসিভার হাতে চেপে ধীরেনদাকে তিনি বললেন, 'মিষ্টি আনান! এইমাত্র প্রিয় আপনার শিয়ালদা আসন কনফার্ম করল।'

সে মিষ্টি এসেছিল। অদৃষ্টের পরিহাস বলছিলাম, কারণ পাঁচ বছর পর '৭৭-এ রাজ্যে কংগ্রেসের তিনজন এমপি-র একজন ছিলেন ধীরেনদা। জিতেছিলেন কাটোয়া থেকে!

কিন্তু 'শুধু কংগ্রেস'-এর কারণে রাজ্যে রাজনীতির চেহারাটা গিয়ে দাঁড়াল গোষ্ঠী রাজনীতিতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই রাজনীতির সূত্রপাতও মানুদার হাতে। '৭২-এ কংগ্রেসের বিধাননগর অধিবেশনে কংগ্রেসের চার তরুণ বিধায়ককে আলাদাভাবে ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন মানুদা। এঁরা ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত বসু, বারিদবরণ দাস, পঙ্কজ ব্যানার্জি এবং সোমেন মিত্র। মানুদা ইন্দিরাজিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, রাজ্যের যুব রাজনীতিতে প্রিয়-সুব্রতই শেষ কথা নয়। আরও যোগ্য লোক রয়েছে। এই চারজন হলেন সেই বিকল্প নেতৃত্ব। তবে বিধানসভার অধিবেশন আমাকে সেই বয়সেই নিজের দক্ষতা প্রমাণের একটা সুযোগ করে দিয়েছিল। অধিবেশন উপলক্ষে যে জাতীয় স্তরের প্রদর্শনী হয়েছিল, জয়নালদা (জয়নাল আবেদিন)-র প্রশ্রয়ে সে প্রদর্শনী সামলানোর পুরো দায়িত্বটাই পেয়েছিলাম আমি।

'৭২-এ কংগ্রেসকে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আনার পিছনে যে যুব কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, সেই যুব কংগ্রেসকে এই ঘটনা আড়াআড়ি দুটো ভাগে ভাগ করে দিল। অচিরেই যুব কংগ্রেসের বিকল্প 'যুব কংগ্রাম কমিটি' এবং ছাত্র পরিষদের বিকল্প 'শিক্ষা বাঁচাও কমিটি' গঠিত হল এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। শুরু হল এ রাজ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসেরই লড়াই। সিদ্ধার্থশংকর রায় চাইলে এই দ্বন্দ্বের উপশম ঘটাতেই পারতেন। কিন্তু তিনি প্রশ্রয় দিলেন।

শুনলে অবাক লাগবে যে, বামফ্রন্টের ৩৪ বছর এবং তৃণমূল সরকারে পাঁচ বছরের শাসনে এ রাজ্যের জেলখানাগুলিতে 'কংগ্রেস ফাইল' বলে কোনও ফাইল তৈরি হয়নি, কিন্তু সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে প্রতিটি জেলে ছিল সেই নামের ফাইল। কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজনদের জব্দ করার জন্য এমন ফাইল তৈরি হয়েছিল। মিশা প্রভৃতি আইনের জালে কংগ্রেসের লোকেরাই কংগ্রেসিদের বন্দি করার জন্য মেতে উঠেছিল। জলপাইগুড়িতেও বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মীর নাম ছিল 'কংগ্রেস ফাইল'-এ। সেই নামগুলি উল্লেখ করলাম না, কারণ তাঁদের পরিবার অস্বস্তিতে পড়তে পারে।

(চলবে)

অরণ্য মিত্র

৪০

মনামিকে নিয়ে নিজেদের মতো করে পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজনার কাজে নামার কথা ভাবছে সুষমা। ডার্ক ক্যালকাটা আর দিল্লি এক্স— এই দুই যুযুধান অপরাধচক্রের প্রাথমিক সংঘাতে বিচলিত দিল্লি এক্স-এর দাসবাবু। অন্য দিকে, ডুয়ার্সের অরণ্যে আত্মগোপন করে থাকা জঙ্গি পল অধিকারী কি ফের সক্রিয় হচ্ছে? শ্যামলের অন্তর্ধান রহস্যের সূত্র খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যাচ্ছেন কনক দত্ত। বুদ্ধ ব্যানার্জির নির্দেশে এবার দাসবাবুর কাঁধে এল নতুন দায়িত্ব। নেপালের পর্ন প্রযোজক নবীন রাইয়ের সামনে কি কোনও বিপদের হাতছানি? ঘটনার ঘনঘটায় পরতে পরতে ফুটে ওঠা অন্য ডুয়ার্সের কাহিনিতে আসছে একের পর এক মাত্রা।

রাত দশটা। কলকাতা নগরীতে এটা কোনও রাতই না। বুদ্ধ ব্যানার্জির ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে বাইরের উজ্জ্বলতার আভাস জানালা থেকে দূরে বসেও টের পাচ্ছিলেন দাসবাবু। আজ সন্ধে নাগাদ দমদমে নেমেছেন তিনি। এক ঘণ্টা বাইরের ঘরে বসে থাকার পর এইমাত্র ভিতরে এলেন। ছোট খাটটায় বসে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে আয়েশ করে বসে ছিলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। ডান তর্জনীটা একটু গুটিয়ে থুতনিতে লেগে রয়েছে। বাইরে থেকে ছিটকে আসা যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। দাসবাবু মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বুদ্ধ ব্যানার্জি কী বলবেন, সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। ডার্ক ক্যালকাটা আর পল অধিকারীর খবর তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বলতে গেলে বুদ্ধ ব্যানার্জিই এবার ব্যাকফুটে। কলকাতা থেকে তিনি দাসবাবুকে 'ইনফো' দিয়ে সাবধান করবেন— এটাই প্রত্যাশিত ছিল।

এইরকম চুপচাপ, দমবন্ধ পরিস্থিতিতে দশ মিনিটকে এক ঘণ্টা মনে হয়। দাসবাবুর মনে হচ্ছিল এক যুগ।

'পল অধিকারী বেঁচে আছে।'

বুদ্ধ ব্যানার্জি এবার কথা বললেন। দাসবাবু সম্মতি জানালেন মাথা নাড়িয়ে। বুদ্ধ ব্যানার্জি হেলান দেওয়া অবস্থাতেই সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে বলে চললেন, 'পুলিশ ওর সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়েছিল, সেটা আমি পড়েছি। ওরা একটা বডিকে পল অধিকারী বলে সাসপেক্ট করেছিল মাত্র। মিডিয়া সন্দেহটাকে নিশ্চিত বানিয়ে এমন লিখেছিল যে, পল ফিনিশড। ডেড!'

বুদ্ধ ব্যানার্জি থামলেন। একটু দম নিলেন যেন। তারপর বললেন, 'ডার্ক ক্যালকাটা খুব একটা ফ্যাক্টর নয় দাস। কিন্তু পল যদি ওদের ব্যাক করে, তবে ইট মাস্ট বি সিরিয়াস। মোস্ট সিরিয়াস!'

'আমাকে কী করতে বলছেন?' দাসবাবু এবার প্রশ্ন করলেন। 'আপাতত ডুয়ার্সে সব প্রজেক্ট সেট করে রেখেছি।'

'ইনক্লুডিং ঋষিকাম?'

কৌতুকের গলায় জানতে চাইলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। দাসবাবু অল্প হেসে বিনয়ের অবতার হয়ে বললেন, 'আপনার কাছে স্যার সব ডিটেলই থাকে।'

বুদ্ধ ব্যানার্জি প্রশংসাটা উপভোগ করলেন। তারপর সোজা হয়ে বসলেন। 'কোনও প্রজেক্ট থামিয়ে রাখার দরকার নেই দাস।' এবার তাঁর গলার ঢিলে ভাবটা আর নেই। 'তুমি ডুয়ার্স আর নর্থ-ইস্টের দায়িত্ব কাউকে দিয়ে পল অধিকারীকে খুঁজে বের করো। মিট করো। ডিল করো। ইফ পসিব্‌ল, শুট করো।'

'কাজটা করতে অনেক ব্যাক আপ লাগবে।'

বুদ্ধ ব্যানার্জি কথাটা শুনে আবার দেয়ালে হেলান দিলেন। মোবাইল নিয়ে কিছু দেখলেন। তারপর দাসবাবুর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ডার্ক

ক্যালকাটার একটা মাথাকে জানি। জগদীশ প্রসাদ। এমপি। জগদীশের একটা মারাত্মক স্ক্যাম আমি জানি। সেটা মিডিয়ায় ফেললে কাল ওকে রিজাইন করতে হবে। আরও আছে। একটা ভিডিয়ো। দেখবে?'

মোবাইলে একটা ফাইল চালিয়ে সেটটা অবহেলায় ছুড়ে দিলেন দাসবাবুর দিকে। দাসবাবু সেটা লুফে নিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। একটা শাড়ি পরা শ্যামলা রঙের কিশোরীর বুকে হাত বোলাচ্ছেন সাদা চুলের এক ব্যক্তি। তারপর তিনি শাড়ি খুলতে শুরু করলেন। দাসবাবু সেটটা উঠে গিয়ে খাটের উপর নামিয়ে রেখে একটু হেসে বললেন, 'এক্সেলেন্ট স্যার!'

'ব্যাক আপ নিয়ে চিন্তা কোরো না।' বুদ্ধ ব্যানার্জি ফোনে চলতে থাকা ফাইলটা থামিয়ে বললেন, 'তুমি কাল সকালের ফ্লাইটে ডুয়ার্সে ফিরে যাও। বিকেল চারটের সময় জলপাইগুড়ির একটা হোটেলে তোমার সঙ্গে রঞ্জিত বলে একজন দেখা করে চার্জ বুঝে নেবে। পরশু থেকে তোমার একটাই কাজ। টু ফাইন্ড আউট পল অধিকারী।'

দাসবাবু নীরব থাকলেন। এর অর্থ, তিনি সম্মতি জানাচ্ছেন। ডুয়ার্সে পল অধিকারীকে খুঁজে বার করার কাজ কতটা কঠিন, সেটা অনুমান করতে পেরেছেন দাসবাবু। এমন একটি কাজের দায়িত্ব তাঁর উপরে পুরোটাই ছেড়ে দিচ্ছেন বুদ্ধ ব্যান্যার্জি। এটা তাঁর পক্ষে খুবই গৌরবের ব্যাপার।

'জলপাইগুড়িতে কোন হোটেলে উঠবে, সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। ঠিক তখনই দাসবাবুর মোবাইল বেজে উঠল। রিং টোনে একটা হুইসলের আওয়াজ আর তারপর থমথমে মিউজিক। দাসবাবু বুঝলেন এটা মনসুরের কাছ থেকে আসছে। তাঁর ফোন কালেভদ্রে আসে। কিন্তু সব সময়ই আসে খারাপ খবর নিয়ে।

দাসবাবু ফোনটা ধরলেন। তাঁর মুখ-চোখ সহসা কঠিন হয়ে গেল। মিনিটখানেক ওপারের কথা শোনার পর সেটটা পকেটে রেখে বুদ্ধ ব্যানার্জির দিকে তাকালেন। তাঁর কপালে তখন স্বেদবিন্দু।

'বিজু প্রসাদের লাশ পাওয়া গিয়েছে।'

তথ্যটা জানাতে গিয়ে গলা একটু কেঁপে গেল দাসবাবুর। কিন্তু বুদ্ধ ব্যানার্জির আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি শ্রোতাকে চমকে দিয়ে বরং জানতে চাইলেন, 'ফালাকাটা আর কোচবিহারের নতুন রাস্তার মাঝখানে ডেডবডি পাওয়া গেছে, তা-ই তো?'

'আপনি?'

হতভম্ব দাসবাবু একটার বেশি শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন না। ঢোক গিলে থেমে গেলেন। বুদ্ধ ব্যানার্জি এবার উঠলেন ছোট খাটটা থেকে। দাসবাবুর সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর নরম গলায় বললেন, 'বিজু প্রসাদ কাজের লোক ছিল, কিন্তু ওকে ডার্ক ক্যালকাটা কিডন্যাপ করত। সোনারপুরের ছেলেটাকে খুন করবে বলে নিজে যাচ্ছিল সেখানে। হি উড বি ট্র্যাপ্‌ড। বোকা ছেলে কোথাকার!'

দাসবাবু রুমাল বার করে ঘাম মুছতে চাইছিলেন, কিন্তু রুমাল পেলেন না পকেটে। বিজু প্রসাদের জুড়ি সহজে পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু সে ডার্ক ক্যালকাটার হাতে পড়লে অনেক কিছু তছনছ হয়ে যেত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। এই জগৎ বড় নির্মম। অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র সংকটের সম্ভাবনা দেখামাত্র তাকে চিরতরে থামিয়ে দিতে এক সেকেন্ডেরও বেশি ভাবে না।

'গো অ্যান্ড ফাইন্ড আউট পল অধিকারী।'

সেনাধ্যক্ষর সুরে ছুড়ে দেওয়া বুদ্ধ ব্যানার্জির নির্দেশটা কানে যেতেই নিজেকে আবার ফিরে পেলেন দাসবাবু।

৪১

যদিও মাঘ মাসের দুপুর, তথাপি গরম লাগছিল নবীন রাইয়ের। ভেনাস মোড়ের কাছাকাছি নরম আর ঠান্ডা পানীয়র দোকান আছে কি না, সেটা দেখার জন্য তিনি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। ব্যস্ত শিলিগুড়ির রাস্তায় হেঁটে বেড়াবার অভ্যেস নবীন রাইয়ের নেই। কিন্তু আজ তাঁকে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের মতো অটো ইত্যাদি চেপে ভেনাস মোড়ের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে। দেড়টা থেকে আড়াইটের মধ্যে রঞ্জিত আসবে তাঁকে মিট করতে। সে আসছে দাসবাবুর জায়গায়। কোনও একটা গোপন মিশনে দাসবাবুকে লাগানো হচ্ছে বলে তিনি চলে যাচ্ছেন। রঞ্জিত এসে নবীন রাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে কাজ শুরু করে দেবে।

এসব জানার পর থেকেই নবীন রাই উত্তেজিত হয়ে আছেন। সম্ভবত সেই কারণেই গরম লাগছিল তাঁর। তবে দাঁড়াতে খারাপ লাগছিল না। টি-শার্টের উপর আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীর কাছ থেকে ধার করে আনা জ্যাকেটটা পরে থাকা সত্ত্বেও পথচলতি কেউ কেউ তাকাচ্ছিল তাঁর দিকে। নবীন রাই বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁকে খুব একটা সাধারণ দেখাচ্ছে না। তখন তিনি চোখ থেকে তিরিশহাজারি সানগ্লাসটি খুলে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়েছেন। তারপর থেকে খুব কম লোক তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। এবার তিনি জ্যাকেটটাও হাতে নিয়েছেন গরম লাগার কারণে। সেটা সস্তার হলেও বেশ রংচঙে। এইবার আর কেউই প্রায় নবীন রাইকে লক্ষ করছিল না।

দাসবাবু রুমাল বার করে ঘাম মুছতে চাইছিলেন, কিন্তু রুমাল পেলেন না পকেটে। বিজু প্রসাদের জুড়ি সহজে পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু সে ডার্ক ক্যালকাটার হাতে পড়লে অনেক কিছু তছনছ হয়ে যেত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। এই জগৎ বড় নির্মম। অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র সংকটের সম্ভাবনা দেখামাত্র তাকে চিরতরে থামিয়ে দিতে এক সেকেন্ডেরও বেশি ভাবে না।

সাধারণ হতে পেরে নবীন রাই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন, যেটা উত্তেজিত হলেই হারিয়ে ফেলেন কিছুক্ষণের জন্য। রঞ্জিত কেমন লোক, সেটা নিয়ে বেশি ভেবে লাভ নেই। কাজগুলো কাল থেকেই শুরু করে দিতে হবে। 'ঋষিকাম' ছবিটা নিয়ে তাঁর খুব আশা আছে। দুবাই থেকে একটা যোগাযোগ এসেছে। তারা 'ঋষিকাম'-এর গোটা স্বত্বটাই কিনতে আগ্রহী। নবীন রাই এর পর স্বাভাবিক কারণেই মনামির কথা ভাবলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোনও করলেন মনামির নাম্বারে, কিন্তু কেউ ধরল না। রাস্তার এক কোনায় দাঁড়িয়ে একটা এসএমএস ছেড়ে দিলেন 'ঋষিকাম'-এর নায়িকাকে।

কয়েক পা হাঁটলেই একটা পেল্লায় শোরুম। সামনেটা পুরো কাচ দিয়ে ঢাকা। এই শোরুমটার কাছাকাছি তাঁকে থাকতে বলা হয়েছে বলে নবীন রাই একটু পরপরই ফিরে আসছিলেন সেখানে। এবার এসে দেখলেন, প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা একজন স্বাস্থ্যবান লোক উলটো দিক থেকে হেলতেদুলতে হেঁটে আসছে। রঞ্জিতের চেহারার বর্ণনা অনুযায়ী মিলছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন নবীন রাই। লোকটার চোখে সাধারণ চশমা। দাড়িগোঁফ চকচকে করে কামানো। এটাও মিলে যাচ্ছিল। শুধু দেখার ছিল চশমার ফ্রেমের ডাঁটি সাদা কি না। সেটা আরেকটু কাছে না এলে বোঝার জো নেই।

কাছাকাছি আসতেই মিলে গেল রংটুকুও। নবীন রাই লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যানাকোন্ডা।'

'অ্যানাকোন্ডা ইন্ডিয়া। প্লিজ ফলো মি!'

রঞ্জিত এগিয়ে গেল কিছুটা। নবীন রাই কয়েক কদম হেঁটে আবার ঘুরলেন। রঞ্জিত বেশ আস্তে হাঁটছে। খানিকটা ব্যবধান রেখে

তাকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন নবীন রাই। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর একটা রেস্তরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রঞ্জিত। রেস্তরাঁর সামনেটাও কালো কাচ দিয়ে ঢাকা। তবে এটা চওড়ায় বড়জোর দশ ফুট। নবীন রাই অনুমান করলেন যে, রঞ্জিত রেস্তরাঁতেই ঢুকবে। তিনি হাঁটার গতি বাড়িয়ে রঞ্জিতের সামনে গিয়ে শুনতে পেলেন, 'একটা অটো বা কিছু নিয়ে নিই। মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাব। নাইস প্লেস ফর আওয়ার ক্যাজুয়াল মিটিং!'

রঞ্জিতের বাংলা দিব্যি বাঙালির মতো। ইংরেজিটাও বেশ ফুরফুরে শোনাল। নবীন রাই বললেন, 'শিয়োর!'

ওদের পাশ দিয়ে একের পর এক গাড়ি চলে যাচ্ছে। একটা সাদা ছোট গাড়ি ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থমকে গেল। নবীন রাই সরে এলেন রেস্তরাঁর দিকে। তিনি চাইছিলেন একটা উপযুক্ত অটো, যেটা তাঁদের নৌকাঘাট মোড়ের কাছে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে ফের অটো ধরে মেডিক্যাল কলেজ। দারুণ চয়েস!

তখনই থমকে যাওয়া সাদা গাড়ির পিছনের জানলার কাচ নামতে শুরু করল। নবীন রাই যখন সেদিকে চোখ ফেরালেন, তখন কাচের ওপারে থাকা একটা মানুষের আবছা মুখ এবং একটা নল নজরে পড়ল তাঁর। পরক্ষণেই কিছু একটা তাঁকে ঘাড় ধরে মাটিতে ঝুঁকিয়ে দিল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল রেস্তরাঁর কালো কাচের আবরণ। এর পর প্রচণ্ড হইহল্লা, চিৎকার ইত্যাদির মধ্যে ডুবে যাওয়ার আগে নবীন রাই টের পেলেন, রঞ্জিত আবার তাঁকে দুই কাঁধ ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল।

'দে ট্রাই টু শুট ইউ, বাট ফেইল্‌ড। নাউ জাস্ট ভাগো। মিট ইউ লেটার।'

রাস্তায় গাড়িগুলো ভিড়ের চাপে প্রায় থমকে গেলেও সেই সাদা গাড়িটা নেই। নবীন রাই একবার রেস্তরাঁটার দিকে তাকালেন। তারপর দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন।

ঘণ্টাখানেক পর টিভি চ্যানেল থেকে নবীন রাই জানলেন যে, শিলিগুড়ির ব্যস্ততম রাস্তায় দিনেদুপুরে একটা সাদা গাড়ি থেকে গুলি চলেছিল। সে গুলি রেস্তরাঁর কাচ চৌচির করে ভিতরে ঝাড়লণ্ঠনের বারোটা বাজিয়ে দেয়ালে গর্ত করে আটকে গিয়েছে। ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে পড়ার কারণে তিনজন অল্পবিস্তর আহত। রেস্তরাঁর প্রবেশপথে সিসি ক্যামেরা ছিল না। ফরেনসিক রিপোর্ট না এলেও গুলিটার ধ্বংস করার ক্ষমতা দেখে অনুমান করা হচ্ছে, অস্ত্রটি বেশ কড়া ধাঁচের। গুলি চলার শব্দ কেউ শোনেনি। তার মানে সাইলেন্সার লাগানো ছিল।

নবীন রাইয়ের ঘাম দিয়ে বাকি জ্বরটা ছাড়ল। এর মধ্যেই খানিকটা হুইস্কি খেয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এবার আরও খানিকটা খাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। রঞ্জিত সময়মতো তাঁকে ঝুঁকিয়ে না দিলে ওই বুলেট নির্ঘাত তাঁর মাথার অর্ধেকটা নিয়ে রেস্তরাঁর কাচের দেয়ালে ধাক্কা মারত।

৪২

মনামি নিজের ঘরে একটা সোফায় আধশোয়া হয়ে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনছিল। সকাল এগারোটা বেজে গিয়েছে। খোলা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল রোদ্দুর এসে পড়ছে তার শরীরে। মনামির বেশ আরাম হচ্ছিল। তাদের প্রজেক্টের জন্য সুষমা যে এজেন্সিকে দায়িত্ব দিয়েছিল, তাদের সূত্র থেকে আসা প্রথম কাজটি সে গতকাল সেরে এসেছে। ক্লায়েন্টের নাম ব্রজগোপাল হনুমানদাস। বিকেল নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত আটটার মধ্যেই ফিরে এসেছিল মনামি। হনুমানদাস পুরো বোল্ড আউট। তাঁর মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে দিয়ে ফিরেছে মনামি। কনট্রাক্টের বাইরেও চার হাজার অতিরিক্ত পাওয়া গিয়েছে। টাকা সবই তার কাছে। একটু পরে সুষমা এলে সেটা তাকে দিয়ে দেবে। তারপর সেলিব্রেশন হতে পারে।

সুষমা বলেছিল সাড়ে এগারোটা নাগাদ আসবে। মনামি তাই অলসভাবে গান শুনতে শুনতে অপেক্ষা করছিল। ক্লায়েন্টের সঙ্গে রাতে বা বাইরে যাওয়ার চুক্তি থাকলে সুষমা যাবে। মনামিকে রাতে বাড়ির বাইরে থাকার জন্য কোনও একটা অজুহাত খাড়া করতে না পারলে আপাতত এভাবেই চলবে তাদের ব্যবসা। কিন্তু তাদের কেউই মাসে দুটোর বেশি ক্লায়েন্ট নেবে না। তারপর হিসেব করে কোনও একটাকে ফাঁদে ফেলতে পারলেই বোনাস।

সুষমা প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরেই এল। এসেই ব্যাগটা বিছানার উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে মনামির পাশে ধপাস করে বসে বলল, 'এবার বলো, কী হল?'

'সো নাইস!' মনামি গানের প্রাবল্য কমিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে উত্তর দিল, 'বয়স হলে কী হবে, জোর আছে। একটু পারভারশনও আছে। নেক্সট টাইম সেটা ক্যাশ করব। ওভার অল এনজয়েবল।'

'নেক্সট টাইমের ডিলও করে এসেছ নাকি?' সুষমার গলায় কপট ধমক শোনা গেল, 'বাইরে তো যেতে পারছ না। শিলিগুড়িতেই?'

'হনুমানদাস আবার বাইরে যেতে চান না। শিলিগুড়িতেই উইকলি একবার সেবা পেতে আগ্রহী।' চোখ বন্ধ করেই বলল মনামি।

তার বলার ধরন দেখে হাসি পেয়ে গেল সুষমার। সোফা থেকে উঠে ব্যাগটা খুলতে খুলতে বলল, 'তবে তো মাসে চারটে অ্যাসাইনমেন্ট হয়েই গেল। অবশ্যি আমাকে যদি প্রেফার করে!'

'প্রেফার?' মনামি এবার চোখ খুলে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায় সুষমার দিকে, 'আমি দেখিয়েছি তোমার ছবি। কী বলে জানো?'

'কী?'

'দু'জনকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে কি না!'

'মাই গড!' সুষমা বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিল করে হাসতে থাকে, 'একসঙ্গে দু'জন! হার্ট অ্যাটাক না হয়ে যায়! ডাজ হি টেক ভায়াগ্রা?'

'স্বীকার করল না। বাট আই থট হি হ্যাড। তবে শৌখিন। বিদেশি কন্ডোম ইউজ করে। ওয়াও! হোয়াটা সেক্সি স্মেল!'

সুষমা ইতিমধ্যে ব্যাগ থেকে একটা টিফিন বক্স বার করেছে। সেটা দেখিয়ে মনামিকে সে বলল, 'বাঁশের চাটনির কথা বলেছিলাম না। এই যে এনেছি। ফর সেলিব্রেশন!'

এর পর প্রায় ঘণ্টাখানেক গল্প আর সেলিব্রেশনে কেটে গেল। একটা সময় দেখা গেল, দু'জনেই হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে। সেই অবস্থায় একটা সময় সুষমা হঠাৎ বলল, 'এটা দাঁড়িয়ে গেলে আর সব লাইন ছেড়ে দেব।'

সুষমার গলার স্বরটা বেশ গভীর শোনাল। মনামি তার দিকে পাশ ফিরে বলল, 'তুমি তো প্রায়ই বলো, এই লাইনেই রিস্ক সব চাইতে কম।'

'কম হলেও দেশটা ইন্ডিয়া। পর্ন ইন্ডাস্ট্রি বলে খোলাখুলি এখানে কিছু করা যায় না। তবে সানি লিওনি যখন নায়িকা হচ্ছে মুম্বইতে, তখন একটু হোপফুল তো হতেই পারি। ভাবছি প্যারালাল একটা বিজনেস ধরব।'

'কী?'

'সেক্স টয়। হাউ ইজ দিস?'

মনামিকে অবাক করে দিয়ে পাশে পড়ে থাকা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা আট ইঞ্চি লম্বা ডিলডো বার করে আনল সুষমা। উজ্জ্বল জামরঙের যন্ত্রটা ঘরের আলোয় চকচক করে উঠল যেন। হতবাক ভাবটা কাটিয়ে মনামি উচ্ছ্বসিত হয়ে সোজা হয়ে বসে জিনিসটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'ওয়াও! আনবিলিভেব্‌ল! এটা আমি নেক্সট সোলো ভিডিয়ো শুটে ব্যবহার করব! বাট এ জিনিস কি এদিকে বিক্রি হবে?'

'চুপিচুপি হাতে পৌঁছে গেলে কেনার মেয়ের অভাব নেই।' মৃদু হেসে জানাল সুষমা।

(চলবে)

খুদিদা হালকা চাদরে নিজেকে ভালমতো মুড়িয়ে কেদারায় পা তুলে বাবু হয়ে বসে হিদারুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কেন ডেকেছি জানো?’ হিদারু যেন অনুমান করতে পারছিল তাকে তলব করার কারণটা। কিন্তু মুখে কিছু না বলে চুপ করে মাথা নিচু করে থাকল। খুদিদা বসেছেন তাঁর মুখোমুখি। বেলা শেষ হয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে বাইরে। তাঁর আর গৃহকর্তার মাঝখানে ছোট গোলাকার টেবিলটার উপর একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছে। বাহারে চিমনি লাগানো ল্যাম্পটার আলো বেশ উজ্জ্বল। পিছনের দেয়ালে খুদিদার ছায়াটা অতিকায় দানবের মতো দেখাচ্ছিল।

‘শোনো হিদারু।’ খুদিদা যেন গুছিয়ে বলার প্রস্তুতি নিলেন, ‘উপেনকে তো তুমি ভালমতোই চিনতে। সে যে বছরখানেক হল নিরুদ্দেশ, সেটাও তুমি জানো।’

হিদারু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।

‘তার দুটো-একটা চিঠি যে আমরা পাইনি তা নয়।’ খুদিদা বলতে থাকেন, ‘কিন্তু উপেন যে ব্যবসা-বাণিজ্যে মেতে আছে— এটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার ধারণা, সে সশস্ত্র বিপ্লবী হওয়ার চেষ্টায় ডুয়ার্সেরই কোথাও লুকিয়ে আছে। এ ব্যাপারে তুমি ঠিক কী জানো?’

হিদারু সতর্ক হল। উপেনের খোঁজ নেওয়ার জন্য খুদিদা তাকে ডাকবেন— এটা সে বেশ কিছুদিন ধরেই অনুমান করছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কী জবাব দেবে? খুদিদাকে মিথ্যে কথা বলবে? কিন্তু খুদিদার মতো মানুষকে মিথ্যে বলাটা কি পাপ হবে না?

‘দেখো বাবা!’ খুদিদার গলা নরম শোনাল, ‘উপেন হীরের টুকরো ছেলে। তার বাপ তাকে বুঝতে না চাইলেও আমি বুঝেছি ওকে। কিন্তু অস্ত্র নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কি জেতা যায় বাবা? গান্ধিজি অহিংস আন্দোলনের পথ নিয়েছেন, কারণ তিনি চান না যে, এইসব হীরের টুকরো ছেলে প্রাণ দিক। দেশ স্বাধীন হলে এইসব ছেলেকেই তো দরকার হবে, তা-ই না?’

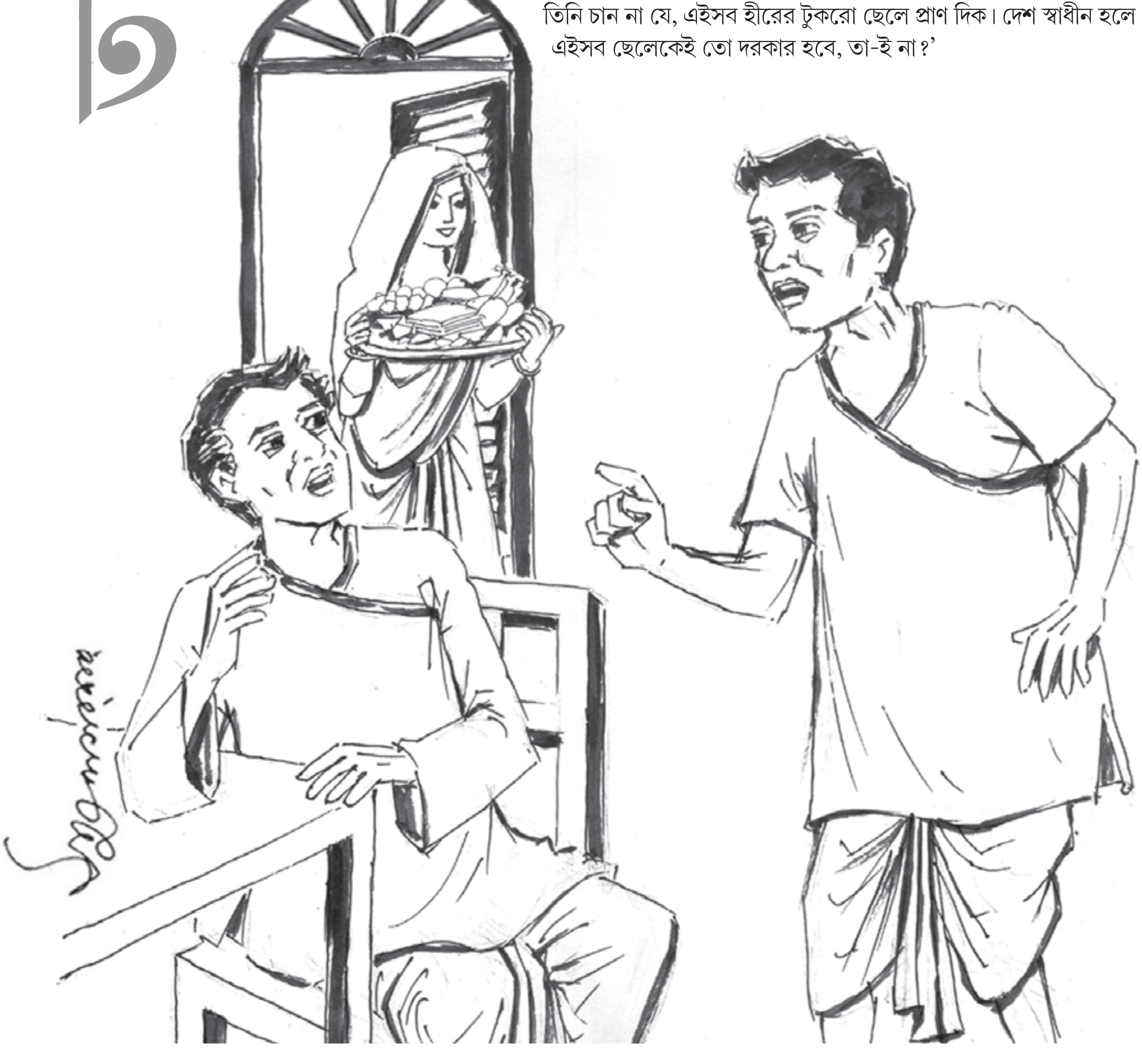

হিদারু চুপ করে থাকে। খুদিদা ভুল কিছু বলছেন না। উপেন তো গান্ধিজির রাস্তা পছন্দ করে না। সে চায় সশস্ত্র আন্দোলনে নেমে শহিদ হতে।

'আমি যদ্দূর খবর পেয়েছি, তারিণী বসুনিয়ার সঙ্গে উপেনের যোগাযোগ হয়েছিল।'

হিদারু এবার মনে মনে চমকাল। খুদিদার কাছে এই খবরটা থাকবে, সেটা সে ভাবেইনি। তবুও সে চুপ করে বসে থাকল। খুদিদা তার নীরবতা লক্ষ করে কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকলেন নীরবে। মিনিটকয়েক অখণ্ড স্তব্ধতা থমথম করতে লাগল খুদিদার বিরাট বৈঠকখানায়। একসময়ে তিনি পায়চারি থামিয়ে হিদারুর সামনে টেবিলে দু'হাতে ভর দিয়ে স্নেহের সুরে বললেন, 'তুমি বয়সে ছোট। তবুও তোমাকে অনুরোধ করছি, কিছু লুকিয়ো না। উপেনের বাড়ির লোক তো বটেই, আমরাও সবাই ওকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি বাবা! তা ছাড়া শোভার বিয়েও ঠিক হতে চলেছে।'

হিদারু চোখ তুলে খুদিদার দিকে তাকাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে মৃদু স্বরে বলল, 'জলপাইগুড়ি থেকে উপেন আর আমি তারিণীদার কাছে গিয়েছিলাম। ও এখন বোধহয় আলিপুরদুয়ারে আছে।'

'গগনেন্দ্র কি তার খবর জানে?'

অতঃপর হিদারু আর কিছু গোপন করল না। খুলে বলতে লাগল খুদিদার অজ্ঞাত কাহিনি। তারিণী বসুনিয়ার সূত্রে গগনেন্দ্রর সঙ্গে উপেনের আলাপ। তাঁর চিঠি নিয়ে গগনেন্দ্রর এ বাড়িতে আসা। দেশলাই বাক্সের মধ্যে পাঠানো চিরকুট— সবটাই খুলে বলল সে। আসন্ন পূর্ণিমাতে সে আর গগনেন্দ্র যে আলিপুরদুয়ারে যাবে বলে ভেবেছে, সেটাও জানাল হিদারু। খুদিদা সব শুনলেন। তারপর কিছুক্ষণ ছাদের দিকে টানা পাখাটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন একদৃষ্টিতে। শেষে হিদারুর উদ্দেশে বললেন, 'তুমি কি আলিপুরদুয়ার যাচ্ছ?'

'সম্ভবত যেতে পারছি না। কিন্তু গগনেন্দ্র বোধহয় যাবেই।'

'ওকেও যেতে দেওয়া যাবে না।' খুদিদা হাসলেন, 'তুমি এতগুলো খবর আমাকে দিলে, এবার আমি একটা খবর তোমাকে জানাচ্ছি। শোভার বিয়ে গগনেন্দ্রর সঙ্গেই হচ্ছে।'

হিদারু প্রচণ্ড অবাক হয়ে খুদিদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'আমি আলিপুরদুয়ারে লোক পাঠিয়ে উপেনকে খুঁজে আনব হিদারু।' খুদিদা যেন একটু উত্তেজিত, 'আমি চাই যে, তুমি আর উপেন বিয়ের দিন জলপাইগুড়িতে থেকে সব দায়িত্ব সামলাবে। আমি আজকেই কলকাতায় উপেনের বাবাকে লিখছি। দরকার হলে উপেনকে খোঁজার জন্য পুলিশের হেল্প নেব আমরা।'

কথাটা শেষ করে দ্রুতপায়ে বাড়ির অন্দরে চলে গেলেন খুদিদা। হিদারু স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল। তারপর একসময়ে নিজের মনেই হেসে ফেলল ফিক করে। হায়! গগনেন্দ্র তাকে 'লভে' পড়ার কথা বলেছিল একদিন। হিদারু নেহাত বোকা বলেই বুঝতে পারেনি রহস্যটা। নিজের বোকামোর কথা ভেবেই হাসি পেয়ে গেল হিদারুর। মিনিট দশেক পর যখন চাকা লাগানো একটা টেবিলে রকমারি খাবারের প্লেট সাজিয়ে কাজের লোকটি তার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন হিদারু লক্ষ করল সঙ্গে আসা খুদিদার মুখে প্রশান্তির ছাপ।

'এবার ডান হাতের কাজটা শুরু করে দাও হিদারু।' তিনি সহাস্যে বললেন, 'উপেনের ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন করেছিলে বলে নিজেকে অপরাধী ভাবার কোনও কারণ নেই। তোমার জায়গায় আমি থাকলে হয়ত এটাই করতাম।'

'উপেন বিপ্লবী হতে চায়।'

হিদারুর কথায় ম্লান হাসলেন খুদিদা, 'টাউনের অবস্থা তো দেখছ হিদারু। গান্ধিজির আইন অমান্য ব্যাপারটা টাউনে এতটা সাড়া ফেলবে, সেটা ইংরেজরা আগে থেকে অনুমান করতে পারেনি। তবুও কেমন কড়া স্টেপ নিচ্ছে, সেটা তো দেখছ। পরের বার ওরা অনেক সতর্ক থাকবে। এবার লাঠি চালিয়েছে, জেলে পুরেছে, হাত-পা বেঁধে গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসছে— পরের বার এতসব করবে না। শুরুতেই গুলি চালিয়ে দেবে। আর, আলিপুরদুয়ারে থেকে উপেন কীভাবে আন্দোলন চালাবে হিদারু? এই ডুয়ার্সের সে কতটুকু চেনে? তারিণী বসুনিয়া নিজেও তো সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে নয়। না না হিদারু! তোমার বন্ধু যেটা করছে, সেটা ছেলেখেলা। আমি গোপালকে আলিপুরদুয়ারে পাঠাব বলে ঠিক করেছি। তাকে ডাকতে লোক পাঠালাম এইমাত্র। তা তুমি খাচ্ছ না যে!'

হিদারু আর কিছু বলল না। মাখন লাগানো পাউরুটি তুলে নিল প্লেট থেকে। খুদিদার নির্দেশে পেট ভরে খেতে হল তাকে। তারপর গগনেন্দ্রকে কিছু জানাবে না— এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন বাড়ি ফেরার জন্য উঠল, তখন আরও এক ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। হিদারুর আপত্তি সত্ত্বেও খুদিদা তাকে নিজের ঘোড়ার গাড়িতে ওঠালেন জোর করে। গাড়ি হিদারুকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই আরও একটা গাড়ি এসে থামল সেই বাড়ির দরজায়। হন্তদন্ত হয়ে সে গাড়ি থেকে নামলেন গোপাল ঘোষ। তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে খুদিদা সংক্ষেপে হিদারুর কাছ থেকে জানা সংবাদ জানিয়ে বললেন, 'আলিপুরদুয়ার থেকে উপেনকে খুঁজে আনার কাজটা তোমাকেই করতে হবে গোপাল। এটা আমার অনুরোধ।'

গোপাল ঘোষ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন।

'আমি দেখছি যাতে পুলিশের সাহায্য তুমি পাও।'

'কালকেই রওনা দিচ্ছি খুদিদা! আলিপুরদুয়ারে আমার চেনাশোনা অনেক লোক আছে।'

'কিন্তু তোমার ব্যবসা আছে। সেসব একটু গুছিয়ে নেবে না?'

'ব্যবসা তো সারাজীবন করব দাদা!' উত্তেজনায় গোপাল ঘোষ গোটা ঘরটা কয়েকবার পায়চারি করে ফেললেন, 'কিন্তু আপনি যেটা করতে বলছেন, সেটা হল গ্রেট জব। উপেন যদি আলিপুরদুয়ারের কাছাকাছি কোথাও থাকে, তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তাঁকে ধরে আনব।'

'উপেনের চেহারা তোমার মনে আছে গোপাল? তাকে কি কখনও দেখেছ?'

খুদিদার কথায় গোপাল ঘোষ এবার থমকে দাঁড়ান। তারপর শুকনো মুখে বলেন, 'ফোটো নেই উপেনের? তাকে তো চিনতে হবে! কী করে চিনব বলুন তো?'

'কলকাতায় ওর নিজের বাড়িতে ফোটো থাকতে পারে। আমি কালকেই টেলিগ্রাম করছি। ফোটো এলে তা আলিপুরদুয়ারে পাঠিয়ে দেব। তুমি সেখানে কোথায় থাকবে, সেটা জানিয়ে দিয়ো।'

গোপাল ঘোষ যেন নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল যে, আলিপুরদুয়ারে তাঁর থাকার কোনও জায়গা নেই। ফলে আবার তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখা গেল। শেষে ঠিক হল যে, খুদিদার এক মক্কেলের বাড়িতেই গিয়ে উঠবেন গোপাল ঘোষ। মক্কেলের নাম হেরম্ব দত্ত। কিন্তু তাঁকে কিছুই বলা যাবে না। কারণ হেরম্ব দত্ত হলেন ইংরেজদের অনুগামী। দরকারে বিশেষ একজনের সঙ্গে বরং যোগাযোগ করে নিতে পারেন গোপাল ঘোষ। সেই বিশেষ একজনকে আলিপুরদুয়ারে সবাই জানে মঘা দেওয়ান নামে। খুদিদার মন বলছে যে, মঘা দেওয়ানের সঙ্গে উপেনের যোগাযোগ থাকাটা খুবই সম্ভব।

এর পর বিস্তর আলোচনা হল। অনেক রাতে গোপাল ঘোষ যখন বাড়ির পথে গাড়ি হাঁকালেন, তখন তিনি টগবগ করে ফুটছেন। সম্ভব হলে গাড়িটাকে তখনই আলিপুরদুয়ারের দিকে ছুটিয়ে দিতেন তিনি।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: সুবল সরকার

এমনই বরষা ছিল সে দিন...

বেনি ডে হয়ে গেল স্কুলে! থইথই জল স্কুল মাঠে। ছাত্রছাত্রী আসেইনি। যে ক'জন এসেছে, তাদের কাছেই খবর জুটল— অনেকেই ইতিমধ্যে ঘরছাড়া। স্কুলবাড়িতেও আশ্রয় নিতে পারে যে কোনও সময়। হেডস্যারের কাছে ফোন এল গ্রামপ্রধানের। খান আট-দশেক ঘরের চাবি গ্রুপ-ডি-র কাছে থাকে যেন; প্রয়োজনে খুলে দিতে হবে।

'জল দেখতে যাবেন স্যার? ডুয়ার্সের নদীর জল তো কাছ থেকে আগে দেখেননি!'— ভাড়া ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছাতা মাথায় প্রাক্তন এক ছাত্র বলল।

'তুমি যাচ্ছ বুঝি? কত দূর? কোন নদী?'

'রাঙাতি। তারপরে নোনাই।'

'কীভাবে যাবে?'

'সাইকেলেই যাব। বেশি দূর নয় তো! যাবেন?'

'যাওয়াই যায়! আমার তো এখন কোনও কাজই নেই তেমন।'

তিন দিন থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝমঝম ঝিরঝির টুপটাপ ড্রিমড্রিম! বৃষ্টিরই কত রকমফের! ডুয়ার্সের বৃষ্টি যাঁরা কাছ থেকে দেখেননি, তাঁদের বোঝার সাধ্য নেই— এ বৃষ্টির কত বর্ণিল রূপ। কুড়ি বছর আগে তা ছিল আরও অন্যরকম। একবার শুরু হলে আর যেতে চাইত না। সবুজ ডুয়ার্স ক্রমে সমুদ্দুর হয়ে যেত!

পৌঁছানো গেল রাঙাতির পাশে। গয়েরকাটা থেকে নাথুয়ায় আসতে এ নদীকে বহুবার দেখা হয়েছে। দু'দিকে বিশাল বালুর চর আর মাঝখানে ছিপছিপে নদী বয়ে চলেছে, নীল নীল! মনেই হয়নি এ নদী কখনও দস্যি হতে পারে। নির্ভেজাল ভালমানুষের মতো তিরতির বয়ে চলেছে! বাচ্চারা সাঁতার কাটছে। অনেকে মাছ ধরছে। সেই চেনা দৃশ্যটা আজ অন্যরকম। আজ এ নদী যেন পাগল হয়ে উঠেছে, খেপে উঠেছে! সবার উপর তীব্র ক্রোধ যেন উগরে দিচ্ছে। ঘোলাটে জল উন্মাদের মতো তোলপাড় ছুটছে! সে কী আওয়াজ। যেন লক্ষ পশু রাগে গরগর করছে একসঙ্গে। আর হু হু হাওয়া।

ভয় লাগছিল। অজান্তেই গায়ে কাঁটা!

'কী স্যার, কী বুঝছেন? নদীর এমন রূপ আগে দেখেছেন?'

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

'এ সে নদী? রাঙাতি??' বিস্ময়ে চাপা আওয়াজ বেরল স্যারের গলা থেকে।

'আরও যদি ভিতর ডুয়ার্সে যান, দেখবেন আরও খেপা নদীদের। লিস, ঘিস, ডিমা, ডায়না... সব এখন যাচ্ছেতাই হয়ে আছে!'

'সত্যি ভাবা যায় না।'

'আপনি দেখুন, আমি একটু ব্রিজের ওপারটা দেখে আসি।'

প্রাক্তনী চলল ওপারে। স্যার থাকলেন স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছেন কাদাটে জলে ভেসে ভেসে আসছে ছোট-বড় কাঠের টুকরো, আস্ত গাছও। নদীপাশের বন চেঁছে নিয়ে এসেছে রাঙাতি— বোঝা যাচ্ছে! গ্রামের প্রচুর মানুষ প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে সেই কাঠ বা গাছ ধরবার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেতুতে মোটা দড়ি বেঁধে সার্কাসের মতো ঝুলে নেমেছে জলের কাছাকাছি কিছু কিছু অতি দুঃসাহসী! অন্য অনেকে চিৎকার করে সাবধান করছে, কেউ কেউ উৎসাহও দিচ্ছে।

হঠাৎ সমবেত চিৎকার— 'হরিণ! হরিণ!!'

সত্যিই তো, মাঝনদী দিয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চলেছে একটি সোমত্ত হরিণ। এখনও বেঁচে আছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সকলের নাগালের অনেকটা বাইরে। মাথা তুলছে, ডুবছে! সেভাবেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল দৃষ্টির ঘেরাটোপ থেকে। পাড় ধরে কিছু মানুষ ছুট লাগাল, ধরতে হবে। দুরামারি থেকে শ্যালিকাকে বন্যা দেখাতে নিয়ে এসেছেন সদ্য-হওয়া-জামাইবাবু! সুন্দরী সেই মেয়ে বৃষ্টির বাইকে জামাইবাবুর সঙ্গে লেপটে এসেছে। যৌবনমুখর রক্তে শালিকে শিভালরি দেখাবার তাগিদ! জামাইবাবু বললেন, 'তুমি ব্রিজের উপর দাঁড়াও। আমি একটু নদীতে পা ধুয়ে আসি!' বাইক চালাতে চালাতে তাঁর বিয়ের বাটার জুতোয় কাদা লেগেছে কিছুটা!

শহুরে জামাইবাবু নামলেন নদীর কাছাকাছি। রিনরিনে গলা চিৎকার করছে— 'যাবেন না জাম্বু! পড়ে যাবেন।' সেই চিৎকারে জামাইবাবুর হিরোত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে! রাঙাতিকে বুড়ো আঙুল দেখাতে চান

শহুরে জামাইবাবু নামলেন নদীর কাছাকাছি। রিনরিনে গলা চিৎকার করছে— 'যাবেন না জাম্বু! পড়ে যাবেন।' সেই চিৎকারে জামাইবাবুর হিরোত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে! রাঙাতিকে বুড়ো আঙুল দেখাতে চান রোমান্টিক যুবা! অল্প কাদার পা ডুবে গেল প্রবল কাদায়! জেদ বেড়ে গেল জামাইবাবুর। নদীকে ছুঁতেই হবে। কোনও দিন নদীতে না-নামা যুবক চলল ভরা শ্রাবণের খেপাটে নদীর কাছে। তাকে কি মৃত্যু টানছিল? মৃত্যু কি এভাবেই কখনও কখনও কাউকে নিজের দিকে টেনে নেয়?!

রোমান্টিক যুবা! অল্প কাদার পা ডুবে গেল প্রবল কাদায়! জেদ বেড়ে গেল জামাইবাবুর। নদীকে ছুঁতেই হবে। কোনও দিন নদীতে না-নামা যুবক চলল ভরা শ্রাবণের খেপাটে নদীর কাছে। তাকে কি মৃত্যু টানছিল? মৃত্যু কি এভাবেই কখনও কখনও কাউকে নিজের দিকে টেনে নেয়?!

সে পৌঁছাল নদীর কাছে। অবশেষে পৌঁছালই। ততক্ষণে কাদা মাখামাখি তার পুরো পা। ক্যামারো জিন্স আর নীল নেই! তাকে নামতেই হবে নদীতে।

শালি চিৎকার করছে, রিনরিনে গলা এখন অনেকটা আর্তনাদের মতো— 'খবরদার জাম্বু! আর এগবেন না...'

শুধু শ্যালিকা নয়, অনেক মানুষ এবার চেঁচাতে লাগল— 'সাবধান, আর এক পা

এগবেন না, বিপদে পড়বেন!’

অনেকে বলতে লাগল, ‘এ কি পাগল নাকি?’

ততক্ষণে তার এক পা নদীর দিকে শূন্যে। ঘটনাটা নিমেষেই ঘটল। যেন একটি মানুষ আত্মসমর্পণ করল নদীর কাছে। নদী যেন তাকে টেনে নিল এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে। জামাইবাবু ডুবে গেলেন। তাঁকে আর দেখাই গেল না!

যেন একটা থ্রিলার ছবি! ব্রিজের উপর পা রাখতেই ভয় হচ্ছে স্যারের। তিনি ব্রিজের একপাশে দাঁড়িয়ে নদীকে দেখছেন। কোলাহল, আর্তনাদ সব ছাপিয়ে কোথায় যেন একটা দর্শন কাজ করছিল তাঁর মধ্যে। এভাবেই খড়কুটোর মতো সব নিমেষে ভেসে যেতে পারে। পারেই তো!

রাঙাতি হু হু করে বইছে। মেয়েটি ছুটতে ছুটতে ব্রিজের ওপারে গিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। তাকে ঘিরে ভিড়। বাড়িতে খবর দিতে বাইকে ছুটল কেউ। অনেকে ‘আহাম্মক’ বলে গালি দিতে লাগল সেই সদ্যবিবাহিতকে। অনেক বর্ষা নিয়ে যার জন্য ঘরে অপেক্ষা করছে তার নতুন বউ।

নদীর কিন্তু কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই! ক্রমাগত আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে সে। জলস্তর বাড়ছে বীভৎসভাবে। ব্রিজ প্রায় ছুঁয়ে ফেলার দশা। ইতিমধ্যে পুলিশ এসেছে। তারা চেঁচাচ্ছে, ‘ব্রিজ থেকে নেমে যান সবাই। জলদি। অবস্থা ভাল না।’

অনেকে নিজেরাই ভয় পেয়ে সেতু ছাড়ল।

এবারের ঘটনাটিও নিমেষেই ঘটল। হঠাৎ প্রবল আওয়াজ। হুড়মুড় করে রাঙাতি ব্রিজ মাঝামাঝি ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নদীর বুকে। আর রাঙাতি যেন তাকে সময় নষ্ট না করে চটপট লুফে নিল!

কোথায় গেল প্রাক্তনী? স্যার খুঁজছেন তাকে। এপারে ভিড়, ওপারে ভিড়— আকাশ ঘন কালো। আরও জোরে বৃষ্টি আসছে। অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু সে তখন নদীর ওপারে। ভাঙা ভাঙা তার কথা কানে এল— ‘স্যার, আপনি ফিরে যান। আমার আর অন্য উপায় নেই। ধূপগুড়ি হয়ে ফিরতে হবে।’

স্যার ফিরলেন একা একা। আবার তিন কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে। আর সে দিন অনেক রাত করে তিনবার গাড়ি পালটে অনেক ঘুরপথে সেই প্রাক্তনীকে নাথুয়া ফিরতে হয়েছিল প্রায় ছেচল্লিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। তার সাইকেল সে ফেরত পেয়েছিল তিন মাস বাদে!

পথিক বর

বই পত্রের ডুয়ার্স

বোধপুষ্পের বাগান

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বিজয় দে-র নাম বহুশ্রুত কি না জানি না, কিন্তু কবিতাপ্রেমীরা তাঁকে না পড়ে থাকলে ঠকেছেন। ‘বাবলিবাগান’ তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থযুগলের

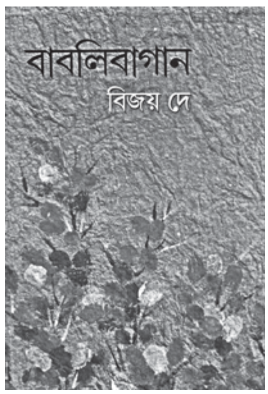

একটি। বইটি কৃশ। মাত্র ৪৮ পাতার। জীবনানন্দর কবিতা-গদ্য-উপন্যাস-গল্প পড়তে পড়তে বিজয় তাঁর ভাললাগা পঙ্‌ক্তিগুলি লিখে রাখছিলেন। সঙ্গে লেখা হচ্ছিল পঙ্‌ক্তিগুলিকে ঘিরে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব। অচিরেই অনুভবের লিখিত চেহারা বদলে যেতে শুরু করেছিল কবিতায়। ‘বাবলিবাগান’-এর উৎস সম্পর্কে বিজয় নিজেই এটা জানিয়েছেন বইতে। প্রতিটি কবিতার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে জীবনানন্দ দাশ রচিত সংশ্লিষ্ট পঙ্‌ক্তি।

বিজয়ের লিখন দুরূহ তো নয়ই, জটিলও না। তাঁর কবিতায় রসিক মনের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। বলার ভঙ্গিতে কখনও মৃদু ঠাট্টার সুর টের পাই। তাঁর কবিতা পড়ার একটা মজা আছে। জীবনানন্দ পড়তে গিয়ে তিনি পেয়েছিলেন একটা এমন পঙ্‌ক্তি— ‘জীবন অজস্র তরঙ্গ প্রতিতরঙ্গের একটা মর্মান্তিক কলরব’। এই বিজয়কে দিয়ে লিখিয়ে নিল ‘আঃ লাটাগুড়ি’ নামের একটি কবিতা, যা শুরু হচ্ছে এভাবে— ‘দু’বেলা ভাত খাই। লাটাগুড়ি যাই/ তারপর একটার পর একটা মৃত হাতির আত্মা কিনে আনি।’ জীবনানন্দ পাঠ এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া এমনই সাযুজ্যহীন। আপাতভাবে। ‘মর্মান্তিক কলরব’। বিজয়ের হাতে যেন লাটাগুড়ির সঙ্গে কাঁটা চামচের বিবাহের সম্ভাবনায় রূপান্তরিত হল। অথবা মনে হল যে, তরঙ্গ-প্রতিতরঙ্গের অভিঘাতে লাটাগুড়ি জঙ্গল বমি করছে!

কবিতাটি এবং বিজয়ের আরও অনেক কবিতা পড়তে পড়তে পাঠকের ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি ফুটে ওঠা বিচিত্র নয়। ‘বাবলিবাগান’-এ এমন একগুচ্ছ উপভোগ্য কবিতা পাওয়া যাবে। ‘সিরিয়াল’ একটা অতি চমৎকার কবিতা। ‘বাস্তু ও ঘুঘু’ কবিতার শুরু এমন পঙ্‌ক্তি দিয়ে— ‘তুমি কেমন করে খুন করো হে খুনি’। এর পিছনে ক্রিয়াশীল জীবনানন্দ রচিত পঙ্‌ক্তিটি পড়লে পাঠকের অন্তর থেকে কে জানি বলে উঠবে, ‘ঠিক ঠিক’। সব মিলিয়ে বইটি পাঠ করার পর এক ধরনের ‘সুখ’ অনুভূত হবে। সরস ও স্নিগ্ধ জীবনদৃষ্টির আলোয় গভীর সত্য বড় সহজে উন্মোচিত হয়। এ জিনিস সবাই পারে না। শব্দকোলাহলমত্ত কবি নন বিজয়। অজস্র পরস্পর বিরোধী চিত্রকল্প রচনা করে পাঠককে দুর্বোধ্য প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন করাতেও তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। চলমান জীবনের বাঁকে বাঁকে আপাততুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে দর্শনের সুগভীর উপস্থিতি সাম্প্রতিক কবিতায় প্রায় নির্বাসিত। সেসব নাকি ‘সেকেলে’। সুখের কথা যে, বিজয়ের মতো কেউ কেউ এই নিয়মে আস্থা রাখেননি। তাই ‘বাবলিবাগান’ লেখা হয়েছে। নবীন কবিদের উচিত বইটি মন দিয়ে পড়া। মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত প্রচ্ছদ মানানসই।

বাবলি বাগান। বিজয় দে। এখন কবিতার কাগজের উদ্যোগ। জলপাইগুড়ি। ৫০ টাকা।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ডুয়ার্স আর গল্প

জঙ্গল-পাহাড়-নদী-চা-বাগান। সমভূমি, বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত ডুয়ার্সের প্রকৃতি অতুলনীয় সৌন্দর্যে ভরা। এই ডুয়ার্সের পটভূমিতে ছাব্বিশটি গল্প নিয়ে ‘গল্পে ডুয়ার্স’ সংকলনটি সাজিয়েছেন পাঁচজন সম্পাদক। গল্পগুলি মানের বিচারে উত্তীর্ণ। কয়েকটি গল্প

পড়ে বেশ আনন্দ পেলাম। অশোক বসুর ‘তিন্নির ডলপুতুল’ এক অব্যক্ত প্রেমের কাহিনি। তিন্নি আর পার্থর অকথিত প্রেম এবং সেই প্রেমের স্মারক হিসেবে ছোটবেলা থেকে পুতুলটা নিজের মননে লালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বিয়ের দু'দিন আগে সে পুতুল তিন্নি উপহার হিসেবে দিয়ে দেয় পার্থকে। ‘অনুক্ত’ নামক তুষার চট্টোপাধ্যায়ের গল্পটিও সুন্দর। সীমা চরিত্রটির ভাষা বুঝতে না পারার যন্ত্রণা, সহকর্মীদের নিয়ে মজা করার গল্প। ‘নিরালায় হানা’ গল্পের বিরাজবাবু সছল চাকুরে। তবুও ফুল চুরি তাঁর নেশা এবং ফুলগাছতলাতেই তাঁর জীবনের অন্তিম পরিণতি। গল্পটি মনে দাগ ফেলে যায়। লিখেছেন অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

দেবাশিস চাকীর ‘চেহার’ গল্পটিতে আছে ফেলে আসা জায়গায় ফিরে আসার জন্য মানুষের অনতিক্রম্য আকর্ষণের কাহিনি। দেবাশিস চক্রবর্তীর ‘দেশের মাটি’ গল্পের ভাবনাও অনেকটা তা-ই। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কম্পাউন্ডারের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে গরিব মানুষের শোষিত হওয়ার কাহিনি নিয়ে রানা সরকার লিখেছেন ‘ঈশ্বর’। বেশ ভাল গল্প মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর ‘সম্পর্কহীনা দূর’। এই অসহায়, ডাইনি অপবাদে বিতাড়িত নারী দুর্যোগের রাতে সাহায্য চেয়েছিল তথাকথিত শিক্ষিত শহরের বাবুদের কাছে। কিন্তু বাবুদের গাড়ি তাকে নেয়নি। মধ্যবিত্তের ভণ্ডামো সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন মৃগাঙ্ক। মেয়েটির মৃত্যুর পর সেতু গড়ে তোলার কাহিনি উত্তম চৌধুরীর ‘আদিনা ব্রিজ’ পড়ার পর অনেক ভাবনা মাথায় ভিড় করে। ভাল লেগেছে ‘দলছুট সেই মেঘ’। গল্পকার সুনন্দা গোস্বামী শুনিয়েছেন মানুষের পাশে মানুষের থাকার শাশ্বত বিষয়।

ভূমিকায় সম্পাদক পঞ্চক জানিয়েছেন, ‘ডুয়ার্সের গল্পগুলো আসলে প্রান্ত উত্তরবঙ্গের জনবসতির মানব-মানবীর জীবনের সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার গল্প।’ সংকলিত গল্পগুলি এই বক্তব্যকে পুরোপুরি মর্যাদা দিতে না পারলেও অধিকাংশ গল্পেই ডুয়ার্সের বিচিত্র সমাজজীবনের কমবেশি প্রতিফলন চোখে পড়ে।

সংকলনটির ছাপা, কাগজ আর বাঁধাই ভাল। কিন্তু প্রচ্ছদটি দেখে সংকলনটিকে ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ বলে মনে হয়। অন্য দিকে, এই সংকলনের জন্য পাঁচজন সম্পাদকের প্রয়োজন কেন হল, সেটাও বিস্ময়ের।

গল্পে ডুয়ার্স। সম্পাদক- অর্ণব সেন, তুষার চট্টোপাধ্যায়, রমা কর্মকার, রণজিৎ মালাকার, উত্তম চৌধুরী। বইওয়ালা, কলকাতা-৫৯। মূল্য ১০০ টাকা।

অমল বিশ্বাস

অ্যাস্ট্রোটার্ফ রানিং ট্র্যাক পাচ্ছে কোচবিহার স্টেডিয়াম

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

বিশাল স্টেডিয়াম, সঙ্গে খেলার মাঠ, একটা ইনডোর স্টেডিয়াম থাকা সত্ত্বেও বড় কোনও খেলা পরিচালনা করানোর মতো আধুনিক পরিকাঠামো এখনও নেই কোচবিহার স্টেডিয়ামে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে নানারকম দাবি জানানো হলেও তা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। কিন্তু হঠাৎই তাদের একগুচ্ছ প্রস্তাবে ক্রীড়া দপ্তরের সম্মতি মেলায় খুশির হাওয়া জেলা জুড়ে।

২৭ জুন কোচবিহার সার্কিট হাউসে রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মুখ্য সচিব সৈয়দ আহমেদ বাবা, জেলাশাসক পি উলগানাথন, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা যুব আধিকারিক লোকসাং দামাং এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিষ্ণুব্রত বর্মনের সঙ্গে বৈঠকে কোচবিহার স্টেডিয়াম নিয়ে যে আলোচনা হয়, তাতে ডিএসএ-র পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। পরদিন সকালেই মুখ্য সচিব কোচবিহার স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন। সবকিছু ঘুরে দেখে তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন বিষ্ণুব্রতবাবু। তিনি বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে মুখ্য সচিবকে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল ৪০০ মিটার অ্যাস্ট্রোটার্ফ রানিং ট্র্যাক, টেবিল টেনিস এবং ব্যাডমিন্টনের জন্য এয়ারকন্ডিশনড মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম, খেলোয়াড়দের জন্য ড্রেসিং রুম, একটি এসি মাল্টিজিম, যেখানে ছেলেমেয়ে উভয়েই অনুশীলন করতে পারে এবং গ্যালারির উপর শেড। তিনি আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে একটা এস্টিমেট তৈরি করে জেলাশাসকের মাধ্যমে পাঠাতে বলেছেন। তবে ইতিমধ্যেই ৪০০ মিটার আধুনিক ট্র্যাকের কথায় তিনি সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন। এটা হয়ে গেলে আগামীতে রাজ্যস্তরের অ্যাথলেটিক মিট হতে কোচবিহার স্টেডিয়ামে কোনও বাধা থাকবে না বলে খুশি ক্রীড়াপ্রেমীরা। এ ছাড়া প্রশাসনিক কারণে বছরের অর্ধেক সময়ই ইনডোর স্টেডিয়াম বন্ধ থাকে। তাই সে সময় টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলা বন্ধ রাখতে হয়। ফলে খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন চালাতে পারেন না। নতুন মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম হলে সেই অসুবিধা দূর হবে বলে দাবি বিষ্ণুব্রতবাবুর। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সুইমিং পুলের জন্য আর্থিক অনুদান মিলেছে, জমি জটও কেটে গেছে। এখন সুইমিং পুল শুধু সময়ের অপেক্ষা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

এক গেঁয়ো ভূগোল শিক্ষকের ডায়েরি থেকে

মেখলিগঞ্জে আমার মামার বাড়ি, কালের নিয়মে যা হারিয়ে গিয়েছে।

হোটেল বুকিং করে ট্র্যাভেল এজেন্সির কাছ থেকে বেড়ানোর আগাম খবরাখবর নিয়ে প্রতি বছর বেড়াতে যাওয়ার চল ছেলেবেলায় আমাদের পরিবারের ছিল না, তবে প্রত্যেক গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে যেতাম উত্তরবঙ্গে। মা বড় হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের একটি প্রান্তিক আধা-শহর মেখলিগঞ্জে। আমার দাদু এই গঞ্জের বিদ্যালয়ের দাপুটে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রজীবনে আচার্য ব্রজেন শীলকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়া এই দীর্ঘদেহী স্বনামধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার ছেলেবেলায় যখন মেখলিগঞ্জে যেতাম, তখন দাদুকে দেখতে না পেলেও প্রতিবেশীদের আচার-আচরণে তাঁর প্রতি সমীহের ভাবটি প্রকাশ পেতে দেখতাম। মা-মাসিরা সকলেই এই শহরের বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, তাই এই গ্রামের মতো শহরটিতে বছরের মাত্র কয়েকদিন কাটালেও খুব আপন বলে মনে হত।

এই বাৎসরিক বেড়াতে যাওয়াতে মামা বা মাসির চর্ব্যচোষ্য খাওয়া ছাড়া অন্য কিছুও দেখার আছে, এবং তার সঙ্গে পড়ার বইয়ের, বিশেষত ভূগোল বইয়ের যে কোনও যোগ আছে, সেটা ক্লাস সিক্সের আগে ঠিক অনুভব করিনি। ক্লাস সিক্সের ভূগোল বইতে পশ্চিমবাংলার ভূগোল নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখলাম চা-বাগান, উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, নদ-নদীর কথা। পড়ার বইয়ের কিছু কিছু নাম মামার বাড়ি যাওয়ার পথের নানান অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলছে ভেবে কিছুটা উত্তেজিত হলাম। সে বছর গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি যাওয়াটাই সম্ভবত আমার জীবনের প্রথম জিয়োগ্রাফিক্যাল এক্সকারশন।

রাতের দিকে বর্ধমান স্টেশন থেকে আলো-আঁধারি দার্জিলিং মেলে সিট খুঁজে স্টেশন থেকে কেনা নতুন বাঁটুল আর হাঁদা-ভোঁদা আঁকড়ে ধরে নিচের বাঙ্কে শুয়ে পড়তে হল। বাধ্যতামূলক শুয়ে পড়ার কারণ, ততক্ষণে মধ্যের বাঙ্কের মালিক সেটি তুলে শুয়ে পড়েছেন। এতদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে বাঙ্ক ভাগ করতে হত। এবারই প্রথম আমার জন্য একটি আস্ত বার্থ। একেবারে নিচের বাঙ্কটাই বেছে নিলাম, কারণ প্রবল ইচ্ছা ছিল, যেসব স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে, সেগুলোর নাম লিখব খাতায়। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, প্রতি বছর নিয়ম করে বাবা দু'টি মোটাসোটা টাইম টেবিল কিনে আনবেন। ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য রেল স্টেশনের নাম আর অবস্থান দেখতেন অবসর সময়ে। আমার প্রথম ভারতের মানচিত্র মন দিয়ে দেখা কিন্তু ওই টাইম টেবিলের পিছন থেকেই। এবার আসার আগে কোন কোন স্টেশনের উপর দিয়ে ট্রেন যাবে, তাদের নাম লিখে নিয়েছিলেন। ইচ্ছা, মিলিয়ে দেখব সেই তালিকা। ট্রেনের ঝাঁকুনি আর মায়ের বকুনিতে ঝিমুনি থেকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝিনি। যখন ঘুম ভাঙল, তখন তাকিয়ে দেখলাম, একটা নির্জন স্টেশনে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। উঁকি মেরে দেখলাম স্টেশনের নাম গুঞ্জরিয়া। সামনে দিগন্ত ছোঁয়া নেড়া মাঠ, মাঝে মাঝে দু'-একটা ঝাঁকড়া গাছ, হালকা কুয়াশা ছড়িয়ে আছে মাঠে— আর ঠিক আমাদের রেললাইনের পাশ দিয়ে মোষের পিঠে চড়ে আমার বয়সি একটি ছেলে লাঠি হাতে চলেছে। তার পিছনে লাইন দিয়ে চলেছে আরও তিন-চারটি মোষ। সেই কৈশোরের দেখা এই সামান্য দৃশ্যটি আমার মনে চিরকালের মতো দাগ কেটে যায়। আজও চোখ বুজলে সেই মোষের পিঠের কিশোরটির মুখ স্পষ্ট দেখতে পাই।

ঢিমেতালে এগতে থাকে ট্রেন। আলুয়াবাড়ি রোড ছাড়ার পর ছোট স্টেশনগুলি, যেখানে দাঁড়ানোর কথা নয় ট্রেনের, সেখানেও দাঁড়াতে দাঁড়াতে এগতে থাকে। ভোরের নরম আলোয় ধুলবাড়ি, ধূমাডাঙ্গি, চটেরহাট, নিজবাড়ি, রাঙাপানি স্টেশনগুলিকে মন হয় কোনও রূপকথার

রাতের দিকে বর্ধমান স্টেশন থেকে আলো-আঁধারি দার্জিলিং মেলে সিট খুঁজে স্টেশন থেকে কেনা নতুন বাঁটুল আর হাঁদা-ভোঁদা আঁকড়ে ধরে নিচের বাঙ্কে শুয়ে পড়তে হল। বাধ্যতামূলক শুয়ে পড়ার কারণ, ততক্ষণে মধ্যের বাঙ্কের মালিক সেটি তুলে শুয়ে পড়েছেন। এতদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে বাঙ্ক ভাগ করতে হত।

পৃষ্ঠা থেকে তুলে আনা কল্পরাজ্য। সে জগৎকে আরও মায়াময় করে তুলত হঠাৎ দিগন্তে ভেসে ওঠা গম্ভীর পর্বতের সারি।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গাড়ি থামার পর বেশির ভাগ মানুষের ব্যস্ততা থাকত দার্জিলিং যাওয়ার ট্রেন বা বাস ধরার। আমরা যেহেতু বেশ কিছুক্ষণ পর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরব, তাই তাড়াহুড়ো থাকত না আমাদের। বোধহয় দার্জিলিং বেড়াতে যাওয়া হবে না ভেবে বাবা দেখাতে নিয়ে যেতেন টয় ট্রেন। মনে আছে, যে ট্রেনটি দার্জিলিং যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল, তার পাশেই অন্য লাইনে কেটে রাখা ছিল টয় ট্রেনের একটি বগি। আমি আর বাবা দু'জন একটু ধাক্কা দিতেই সেটা নড়ে উঠেছিল।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমাদের গন্তব্য নিউ ময়নাগুড়ি। এই রাস্তার দু'ধারে চা-বাগানের সারি। টিনের চালের কাঠের বাড়ি, অসংখ্য সুপারি গাছ, জীবনে প্রথম পর্বত দেখা বা চা-বাগান আমাদের উত্তেজিত করেছিল। চা-বাগান অবশ্য খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম কয়েক বছর পরে বড় মামার কাছে গিয়ে। বড় মামা কাজ করতেন বীরপাড়া থেকে কিছু দূরের একটা ছোট্ট চা-বাগান ডিমডিমাতে।

মেখলিগঞ্জ যেতে হত নিউ ময়নাগুড়ি থেকে বাসে চড়ে। ছোটবেলায় মেখলিগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদীই আমাদের জীবনের প্রথম সবচেয়ে কাছ থেকে দেখা নদী। মায়ের কাছে যে নদীর ভয়ংকর রূপ আর ভয়াবহ বন্যার কথা শুনেছিলাম, সে তিস্তা তখন মৃতপ্রায়। তখন নদীর চরে অনেক লোকের প্রায় স্থায়ী বসবাস। একপাশ দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাওয়া নদী। প্রতিবারই গিয়ে দেখতাম নদীর বুকে বালির পাহাড়, বাঁধের চারপাশে থাকা ছোটবড় নানা আকারের নুড়িপাথর। সেই সময় নেহাতই শখে নানা আকারের নানা রঙের পাথর জমাতে থাকি। পরে একটু-আধটু ভূগোলে পড়তে গিয়ে বুঝি, এসব পাথরের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এখনও ক্লাস এইট বা নাইনে 'শিলা' পড়ানোর সময় ছোট্ট থলের মধ্যে যে পাথরগুলো নিয়ে যাই, তার মধ্যে সেই ছোটবেলার দু'-একটা নুড়িপাথর রয়ে গেছে। পরবর্তীকালে দেশের নানা অঞ্চল থেকে বেশ কিছু পাথরের নমুনা সংগ্রহ করা নুড়ি আজও আমার অতি প্রিয় বস্তু, কারণ এগুলো আমার কাছে শুধু 'শিখন-উপকরণ' নয়, এগুলোর সঙ্গে মিশে আছে আমার শৈশবের অবিস্মরণীয় সুখস্মৃতি। সন্ধ্যার সময় নদী থেকে উঠে আসা জেলেদের কাছ থেকে বোরোলি মাছ কিনে ঘরে ফেরার পথে বাবা শোনাতেন একটু দূরের বাংলাদেশের 'ছিটমহল'-এর কথা।

মেখলিগঞ্জে আমার মামার বাড়ি। দু'টি ঘর ছিল বেশ উঁচু কাঠের খুঁটির উপর কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি। উপরে টিনের চাল, মাঝে উঠোন, একটু দূরে একটা মাটির ঘর আর উঠোনের অন্য পাশে একটু উঁচু মাটির দাওয়াসহ রান্নাঘর। কাঠের ঘর থেকে রান্নাঘর আর অন্য ঘরটিতে যাওয়ার জন্য পাতা থাকত কিছু দূর ছাড়া ছাড়া দুটো ইট। পাশে ছিল একটা বিশাল বাগান, যেখানে আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম গাছ ছিল প্রচুর। চারদিকে সুপারি গাছ তো ছিলই। একপাশে ছিল আনারসের ঝোপ। ফুলঝাড়ু আর তেজপাতা গাছও ছিল ওই বাগানে। মেজ মামা সে সময় মেখলিগঞ্জের সরকারি দপ্তরের কর্মী ছিলেন। মেজ মামার মেয়ে ছাড়াও ছোট মামার দুই মেয়ে আর মাসতুতো দিদিরাও এসে জুটত সে সময়। সন্ধের পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামত। উত্তরবঙ্গে বর্ষা একটু আগেই আসে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায়, তাই প্রতিবারই গরমের ছুটিতে পেতাম বৃষ্টি। সন্ধেবেলা টিনের চালে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে আমাদের ভাইবোনদের হুটোপুটি চলত সমান তালে। অন্য ঘরে দিদার তিন জামাই, মানে বাবা আর আমার অন্য দুই মেসো আর মামার আড্ডা চলত। রান্নাঘরে দিদা, মা, মাসি আর মামিনসোনাদের রান্না করতে করতে গল্প আর হাসির শব্দ ভেসে আসত— একসময় বাবা সবাইকে এক ঘরে ডেকে নিয়ে শুরু করত গান-আবৃত্তি-প্রশ্নোত্তরের আসর। মাসতুতো দিদি, মামাতো বোনরা তখন গান শিখছে পুরোদমে, তারা হারমোনিয়াম নিয়ে একের পর এক গান গেয়ে যেত। হঠাৎ হঠাৎ ঘরের মধ্যে পাওয়া যেত তীব্র আতপ চালের গন্ধ। মেজ মামা বলত, ঘরের নিচে ভাম ঢুকেছে। হঠাৎ উঠোন দিয়ে দৌড়ে যেত দু'-একটা শেয়াল। একটু বৃষ্টি ধরলে মামিনসোনা যখন রান্নাঘরে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে কাঁসার থালা বাটিতে খাওয়ার জায়গা করে দিত তখন ইট পেতে রাখা পিছল রাস্তা ধরে রান্নাঘরে যেতে যেতে দেখলাম দূরের গাছপালায় থোকা থোকা জোনাকির আলো— রান্নাঘরের পিছন থেকে ডেকে উঠত গম্ভীর পেঁচা— একটু দূর থেকে ভেসে আসত জেলখানার ঘণ্টার শব্দ। এম এ পড়ার সময় সেট্‌লমেন্ট জিয়োগ্রাফি স্পেশাল পেপার নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের ঘরবাড়ি সম্বন্ধে পড়তে হয়েছিল। অতি বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে কাঠের ঘর আর টিনের চালের কথা পড়তে পড়তে চোখে ভেসে উঠত সেই শৈশবে ফেলে আসা মামার বাড়ির ছবি।

রাঙামাসি আর মেসোন তখন আলিপুরদুয়ারের রেলের স্কুলে পড়াতেন। রেল কলোনির ছোট দু'কামরার কোয়ার্টারসে আমরা সবাই গিয়ে পৌঁছালাম। সেবার হঠাৎ

আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে একটা ট্রেনে আমরা হইহই করে চড়ে বসলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, ডিজেল টানা যে ট্রেনটি ছাড়ার অপেক্ষায় আছে, তাতে একটিই মাত্র কমপার্টমেন্ট। সেই আশ্চর্য ট্রেনটিতে আমরা কয়েকজন ছাড়া সকলেই স্থানীয় মানুষ।

প্ল্যান হল, আমরা যাব জয়ন্তি পাহাড়ে। সেই আমার প্রথম পাহাড়ের কাছে যাওয়া। সে অভিজ্ঞতা অনেকদিন আগের হলেও আমার মনের মণিকোঠায় এখনও অমলিন।

আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে একটা ট্রেনে আমরা হইহই করে চড়ে বসলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, ডিজেল টানা যে ট্রেনটি ছাড়ার অপেক্ষায় আছে, তাতে একটিই মাত্র কমপার্টমেন্ট। সেই আশ্চর্য ট্রেনটিতে আমরা কয়েকজন ছাড়া সকলেই স্থানীয় মানুষ। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখতে পেলাম ট্রেনের পাশে পাশে চলেছে বড় বড় ট্রাক। সেগুলির কয়েকটিতে বড় বড় পাথরের চাঁই। মাসিমণি বললেন, ওগুলো ডলোমাইট। ডলোমাইট কথাটা তখনও ভাসা ভাসা শোনা, পরে লৌহ-ইস্পাত শিল্প পড়তে গিয়ে শুনলাম ডলোমাইটের কথা।

দমনপুর পেরিয়ে আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়াল একটা অদ্ভুত নামের স্টেশনে। এই স্টেশনের নাম রাজাভাতখাওয়া। এই আশ্চর্য নামের পিছনে কী গল্প লুকিয়ে আছে তা নিয়ে আমরা যখন নানান জল্পনা করছি, তখন আমাদের গাড়ির পিছনে জুড়ে দেওয়া হল একটা বিশাল মালগাড়ি। রাজাভাতখাওয়া থেকে যখন আমাদের ট্রেন ছাড়ল, তখন আমাদের সেই এক কামরার ট্রেন প্রায় 'আশি বগি' লম্বা। বক্সা রোড ছাড়িয়ে আমাদের সেই অদ্ভুত গাড়ি এসে দাঁড়াল জয়ন্তিতে।

জয়ন্তির সেই পাহাড়ের গা বেয়ে তিরতির করে বয়ে চলা ঠান্ডা ও স্বচ্ছ জলের জয়ন্তি নামে ছোট পাহাড়ি নদীতে পা ডুবিয়ে দাপাদাপি করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। বহুদিন পরে বিদ্যাসাগর কলেজের ভিড়ে ঠাসা ইলেভেনের ক্লাসে চুনাপাথরযুক্ত ভূমিরূপ সম্বন্ধে পড়তে পড়তে মনের মধ্যে গেঁথে থাকা জয়ন্তি পাহাড়ের সেই স্ট্যালাকটাইট, স্ট্যালাকমাইট গুহার অস্পষ্ট ছবি ঝলসে উঠেছিল মনে।

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

শ্রীমতী ডুয়াস

এ জীবন পুণ্য করো

ছেলে পিকলু ঠিক আর পাঁচটা বাচ্চার মতো স্বাভাবিকভাবে জন্মায়নি বলে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। বিন্দুমাত্র আশার আলো যেখানে দেখেছেন, ছুটে চলে গিয়েছেন চিকিৎসার জন্য। ব্যর্থ হতে হতে গৃহবন্দিই করে ফেলেছিলেন নিজেকে। তিনি স্বাতী মিত্র মজুমদার, সদর জলপাইগুড়ির বাসিন্দা, জীবনের আশা-নিরাশায় এই চরম দোলাচলে একদিন হতাশাকে ছুড়ে ফেললেন আস্তাকুঁড়ে। জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার থেকে পাওয়া হঠাৎ এক সুযোগে নিজেকে সম্পূর্ণ পালটে ফেললেন তিনি। মনের জোরের কাছে হার মানতে বাধ্য হল ভাগ্য। শুরু হল এক অন্যরকম যুদ্ধ, যে যুদ্ধে কোনও প্রতিকুলতাই কাউকে থামাতে পারে না, বরং প্রতিবন্ধকতা হয়ে ওঠে পরম শক্তি। জলপাইগুড়ি প্রসন্ন দেব মহাবিদ্যালয়ের রাস্তায় ছোট্ট এক ঘরে শুরু হল নতুন পথ চলা, সাথি চারজন বাচ্চা ও তাদের মা। শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুদের নিয়ে গড়ে উঠল এক অন্যরকম প্রতিষ্ঠান, 'প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র'। ১৯৮৭ সালের ১১ জানুয়ারি, পরিত্যক্ত সংস্কৃত টোল সারস্বত চতুষ্পাঠীতে শুরু হল এদের নিয়ে লড়াই। মাসখানেকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তাল, যা আজ পর্যন্ত তিনি কঠোর হাতে সামলাচ্ছেন। পালন করছেন প্রিন্সিপাল হিসেবে তাঁর যাবতীয় কর্তব্য। প্রথম প্রথম অনেকে এড়িয়ে গেলেও পরবর্তীকালে বহু বাবা-মা তাঁদের কথা বলতে না পারা, কানে শুনতে না পারা, চোখে দেখতে না পাওয়া বা মানসিকভাবে পিছানো বাচ্চাদের নিয়ে এসেছেন এই প্রতিষ্ঠানে। এখানকার দিদিমণিদের হাতে নিজেদের সন্তানদের ভার তুলে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। তাতে নিজেদের ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে দিতে না পারার আক্ষেপ যেমন অনেকটা কমেছে, তেমনই এই বাচ্চারা ধাপে ধাপে শিখে ফেলছে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু।

কুড়ি বছরে বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। সেই ভাঙা টোল আজ দোতলা। শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার থেকে বেড়ে প্রায় ২০০-র কাছাকাছি। চিরাচরিত পড়াশোনার বাইরেও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ছোট ছোট অবোধ শিশুর শিক্ষাদান হয়ে উঠেছে এক দৃষ্টান্ত।

পিকলুও মারা গিয়েছে বহুদিন... দিদিমণির লড়াই থামেনি। ট্রেনিং নিয়েছেন অনেক জায়গায়... অনেককে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এখনও সহকর্মীদের সাথে পরিষ্কার করেন বাচ্চাদের করে ফেলা নোংরা। ব্যবস্থা করেছেন ইউনিট টেস্টেরও। ট্রেনিং হয় বাবা-মাদেরও, যাতে এই বাচ্চারা বাড়ি গিয়েও নিজেদের কাজ ঠিকমতো করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের বাচ্চারা আজকাল অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়, মেলায় বিক্রি হয় এদের তৈরি নানা সামগ্রী... এখানকার বাচ্চারাই আবার কখনও প্রতিনিধিত্ব করে স্পেশাল অলিম্পিকে। এই সব কিছু আমাদের হারতে নয়, লড়তেই শেখায়। আজ এখানকার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় দু'শোর কাছাকাছি, এটা যে সত্যিই এক বিরাট সাফল্য তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবু বহু বাধা এসেছে, প্রতিষ্ঠানের নাম ভাঙিয়ে বহু মানুষ তাদের ফায়দা লুটেছে। কিন্তু স্বাতী দিদিমণি সব সামলেছেন নির্দ্বিধায়, হাসিমুখে, কখনও বা শক্ত হাতে। অনেকেই মেনে নিতে পারেন না তাঁর এই কঠোর মনোভাব। তাতে কিছুই যায়-আসে না তাঁর। এই ছোট বাচ্চাগুলোকে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাই তো এরা বড় হওয়ার পরও এদের ছাড়তে পারেন না তিনি। দায়িত্ব নেন এদের স্বনির্ভর করার। ব্রতী হন এমন এক কাজে, যেখানে টাকাপয়সার চাইতেও বেশি গুরুত্ব পায় মানবিকতা, সহনশীলতা। তাই তো তাঁর মুখে এই বাচ্চাগুলোর কথা শুনতে শুনতে মনটা ভারী হয়ে উঠছিল বারবার। সে দিনের সেই লজ্জায়, দুঃখে ছেলেকে লুকিয়ে রাখা মা আজ গর্বিত হন ছেলের পরিচয়ে পরিচিত হয়ে, এমন মাকে আমাদের সবার তরফ থেকে অভিবাদন।

শাঁওলি দে

IIHT যার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিভা এবং সুযোগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা

বিগত ১৩ বছর ধরে IIHT চাকরি সংক্রান্ত আইটি কোর্স করার এক নির্ভরযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন শিল্পের আইটি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। IIHT এইসব দিক খেয়াল রেখে কর্মপ্রার্থীদের দক্ষ এবং বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগযোগ্য করে তোলার দায়ভার গ্রহণ করেছে। IIHT প্রোগ্রাম নিশ্চিত করে সমস্ত ISMAC প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোকে যেমন IT-IMS, Social, Mobility, Analytics এবং Cloud।

IIHT সর্বদাই বিশ্বাস করে উপযুক্ত প্রশিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রদানের। শুধু তাই নয় এতে ক্লাসের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিচারবুদ্ধির আদানপ্রদান করতে পারে। তাছাড়া চাকরিগত যোগ্যতার দিক থেকে দেখতে গেলে, ক্লাসরুমের প্রশিক্ষণ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য যে কোনও অনলাইন ট্রেনিং কোর্সের থেকে। এমনকি ইন্টারভিউ রুমে নিয়োগকর্তারা তাদেরকেই বেশি অগ্রাধিকার দেয় যারা এই ধরনের আইটি কোর্স করেছেন।

আপনি কি আপনার শিক্ষা শেষ করেছেন? ইঞ্জিনিয়ারিং বা উচ্চমাধ্যমিকের পর কি করবেন ঠিক করেছেন? আপনি কি আপনার পছন্দ মতো চাকরি খুঁজে পাচ্ছেন না? আপনি কি কোনও পেশাদারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট খুঁজছেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে IIHT-ই শ্রেষ্ঠ হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যা আপনাকে কাজ ভিত্তিক আইটি কর্মসূচি ও কোর্স প্রদান করে আপনার স্বপ্নকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

IIHT বিশ্বের ২০টি দেশ জুড়ে আছে। আমাদের দেশে আছে মোট ২০০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রতিবছর ৯৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে এক রেকর্ড করেছে এই সংস্থা। এর প্রতিটি আইটি ট্রেনিং প্রোগ্রামই চাকরিগত দক্ষতা গড়ে তোলে। শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতাই নয়, IIHT আপনার নিজের প্রতি আস্থা এবং বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে লড়াই করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

www.iiht.com

IIHT
Connecting Talent to Opportunity

ASIA'S NO.1 HARDWARE, SOFTWARE, NETWORKING, CLOUD AND BIGDATA TRAINING INSTITUTE.

Your job search begins and ends at IIHT. Start now.

PLACEMENT 100% ASSISTANCE

IIHT-ians can be found in: HP/ Intel / IBM / HCL / Accenture

TO KNOW MORE, CALL OR EVEN BETTER WALK-IN TO OUR CENTER

*Conditions Apply

Benefits of the Program
- Mapped with global certifications
- Globally recognised study material
- Curriculum as per job roles in industry
- Hands-on training approach
- Industry certified trainers / instructors

Diploma Programmes:
- ITMS
- Networking
- DotNet
- Java
- Web Application Development

Engineering Programmes:
- Cloud Computing
- Big Data & Hadoop
- Android App Development
- Digital Enterprise Server

IIHT, 19th Baghajatin Park Main Road, Near SBI ATM (Hathi More), Subhash Pally, Siliguri-734001. Phone No. 94340-12579,98320-20723,91265-90038, (0353)2525166

ডুয়ার্সের কুখ্যাত পেটের আম সারানো নয় ডাক্তারের কাম

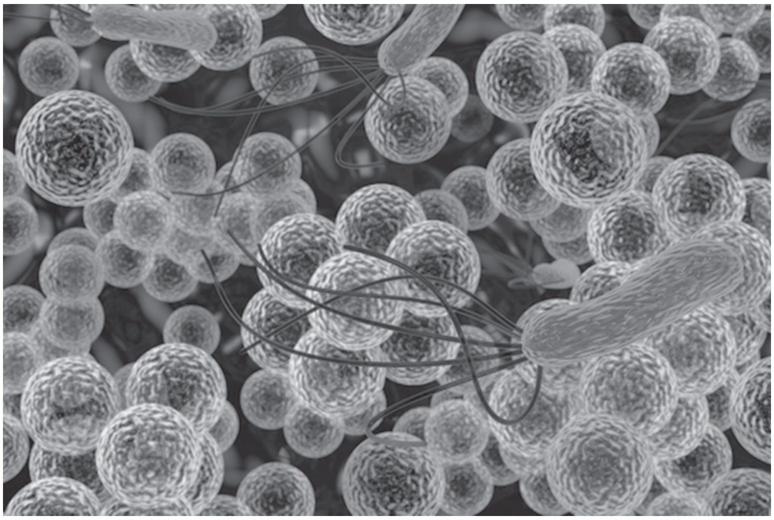

আমাশা বা অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি মানুষের পরিপাকতন্ত্রের অত্যন্ত পরিচিত একটি সংক্রমণের নাম। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ভারতে শতকরা ১৫ শতাংশ মানুষ এই সংক্রমণে আক্রান্ত। অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা নামক একটি জীবাণু (প্রোটোজোয়া শ্রেণিভুক্ত পরজীবী) এই রোগের কারণ। এই সংক্রমণ মানুষের দেহে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট— উভয় রূপেই থাকতে পারে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্স অঞ্চলে বহু মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। বর্ষাকালে এই সংক্রমণের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। আমি পাঠক-বন্ধুদের কাছে খুব সহজভাবে আমাশা রোগটি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

আমাশা রোগের কারণ

অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা জীবাণু জল ও খাবারের মাধ্যমে মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করে। দু'টি ভিন্ন রূপে এই জীবাণু অন্ত্রে অবস্থান করে। একটির নাম ট্রফোজয়েট এবং আর-একটি সিস্ট। ট্রফোজয়েট বংশবিস্তার করে অন্ত্রের মধ্যে সিস্টে পরিণত হয়। সিস্ট মানুষের মলের মাধ্যমে নির্গত হয়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিবেশকে সংক্রামিত করে। বিশেষ করে পানীয় জল এবং খাবারকে দূষিত করে। এই সিস্ট আর্দ্র অর্থাৎ স্যাঁতসেঁতে এবং কম তাপমাত্রার পরিবেশে বহুদিন যাবৎ মানুষের মল, মল দ্বারা সংক্রামিত জল, বর্জ্য পদার্থ ও মাটির মধ্যে বেঁচে থাকে।

সিস্ট দ্বারা সংক্রামিত জল ও খাদ্যবস্তু খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরে এই জীবাণু প্রবেশ করে। শাকসবজি, বিশেষ করে যা উৎপাদনের জন্য জৈব সার ব্যবহার করা হয় অথবা চাষের জন্য ব্যবহৃত জল যদি বর্জ্য পদার্থ অথবা মানুষের মল দ্বারা দূষিত হয় তাহলে এই রোগ ছড়াতে পারে। মানুষই এই রোগের একমাত্র ধারক। যে মানুষের শরীরে এই আমাশা রোগের সিস্ট থাকে, সে মলত্যাগের মাধ্যমে সিস্ট অবিরত পরিবেশে ছড়াতে থাকে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এই সিস্ট।

কীভাবে রোগ ছড়ায়

সিস্ট দ্বারা সংক্রামিত জল ও খাদ্যবস্তু খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরে এই জীবাণু প্রবেশ করে। শাকসবজি, বিশেষ করে যা উৎপাদনের জন্য জৈব সার ব্যবহার করা হয় অথবা চাষের জন্য ব্যবহৃত জল যদি বর্জ্য পদার্থ অথবা মানুষের মল দ্বারা দূষিত হয় তাহলে এই রোগ ছড়াতে পারে।

মানুষই এই রোগের একমাত্র ধারক। যে মানুষের শরীরে এই আমাশা রোগের সিস্ট থাকে, সে মলত্যাগের মাধ্যমে সিস্ট অবিরত পরিবেশে ছড়াতে থাকে। এই কারণে খাবার বানানোর কাজে নিযুক্ত মানুষের থেকে তৈরি খাবারের মাধ্যমে অন্য মানুষের শরীরে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ মানুষের হাতে নখের মধ্যে স্বচ্ছন্দে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এই সিস্ট। মাছি, আরশোলা, ইঁদুরের দ্বারাও ছড়াতে পারে এই রোগ।

রোগের চিহ্ন ও লক্ষণ

❑ ৯০ শতাংশ মানুষের শরীরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অথচ তারা এই রোগের দ্বারা সংক্রামিত এবং বাহক হিসেবে কাজ করে এবং রোগ ছড়ায়।

❑ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শরীরে জীবাণু প্রবেশ থেকে ২-৮ সপ্তাহ সময় লাগে।

❑ মানুষের অন্ত্রে সিস্ট ট্রফোজয়েটে ভেঙে যায় এবং এই ট্রফোজয়েট মানুষের বৃহদন্ত্রে কোলন এবং পায়ুনালিতে ঘা সৃষ্টি করে। কখনও কখনও এই জীবাণু রক্তনালির মাধ্যমে যকৃৎ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পৌঁছে গিয়ে জীবনহানিকর রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

আক্রান্ত রোগীকে সহজেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট খাওয়ালে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পাওয়া সম্ভব। বড়দের ক্ষেত্রে মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট ৪০০ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার খাওয়াতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে ৩০ মিলিগ্রাম/প্রতি কেজি দেহের ওজন হিসেবে দিনে তিনবার সিরাপ খাওয়াতে হবে (অন্তত ৮-১০ দিন)।

লক্ষণ

- ❑ বারে বারে পাতলা পায়খানা হওয়া।
- ❑ পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত এবং শ্লেষ্মা দেখা যায়।
- ❑ মোচড় দিয়ে পেটব্যথা।
- ❑ জ্বর।
- ❑ অতিরিক্ত পায়খানার ফলে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন।
- ❑ শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে রক্তাল্পতা, শারীরিক বৃদ্ধির হ্রাস।
- ❑ ক্রমাগত পেটে যন্ত্রণা ও হজমের সমস্যা।
- ❑ মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয়

ল্যাবরেটরিতে মল পরীক্ষা করালে মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে আমাশার জীবাণুর অস্তিত্ব নির্ণয় করা সম্ভব।

চিকিৎসা

❑ আক্রান্ত রোগীকে সহজেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট খাওয়ালে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পাওয়া সম্ভব। বড়দের ক্ষেত্রে মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট ৪০০ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার খাওয়াতে হবে।

❑ শিশুদের ক্ষেত্রে ৩০ মিলিগ্রাম/প্রতি কেজি দেহের ওজন হিসেবে দিনে তিনবার সিরাপ খাওয়াতে হবে (অন্তত ৮-১০ দিন)।

এ ছাড়াও টিনিডাজোল, ওরনিডাজোল, সেকনিডাজোল, নিমোরাজোল ইত্যাদি ওষুধও কার্যকরী। লক্ষণহীন বাহকের ক্ষেত্রে সিস্ট নির্মূল করার জন্য ডাইলক্সানাইড ফিউরোসেট ৫০০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দিনে তিনবার দশ দিনের জন্য খাওয়ানো দরকার। তবে সকল ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই ওষুধ খাওয়ানো উচিত।

প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ

কোনও ভ্যাকসিন বা ওষুধের মাধ্যমে এই রোগের আগে থেকে প্রতিকার বা মোকাবিলা সম্ভব নয়। এমনকি নির্দিষ্ট জায়গায় সকল মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ খাওয়ালেও এই রোগের সম্পূর্ণ প্রতিকার বা নির্মূলীকরণ সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিক স্তরে এই রোগ যাতে মানুষের মধ্যে এবং মানুষ থেকে পরিবেশে না ছড়ায়, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

১) উন্নত শৌচালয় বানানোর মাধ্যমে যত্রতত্র মলত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে।

২) খাবার বানানো ও প্রক্রিয়াকরণে নিযুক্ত ঘরের এবং বাইরের মানুষদের খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার (অন্তত ১০ সেকেন্ড) সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

৩) মলত্যাগ করার পরেও ভাল করে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

৪) পানীয় জলকে যে কোনও উপায়েই বর্জ্য পদার্থ ও নালানর্দমার জলের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যাবে না। মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে যে জল সরবরাহ করা হয়, তাতে মেশানো ক্লোরিন এই জীবাণু সিস্ট মারতে পারে না। তাই স্যান্ড ফিল্টার ব্যবহার অথবা পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া রাসায়নিকভাবে জীবাণুনাশের থেকে নিরাপদ ও উন্নত পদ্ধতি।

৫) সবজি, ফল খাওয়ার আগে খুব ভালভাবে ধুয়ে নেওয়া জরুরি। এ ছাড়াও জলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (৫-১০ শতাংশ) মিশিয়ে অথবা পূর্ণ মাত্রায় ভিনিগার দিয়ে ফল ও সবজি ধুয়ে নিলে জীবাণু সম্পূর্ণভাবে নাশ করা সম্ভব।

এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা হোটেল/রেস্টুরেন্ট এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী খাবারের দোকানের খাবার তৈরির সঙ্গে নিযুক্ত সমস্ত কর্মীর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, চিকিৎসা দেওয়া এবং তাঁদের মধ্যে রোগ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। বিশেষত নিয়ম করে সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধোয়ার পদ্ধতি শেখানো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, যার মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব।

সর্বোপরি, সমস্ত মানুষকে প্রাথমিক স্তর থেকে স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার মাধ্যমেই দীর্ঘমেয়াদিভাবে এই রোগের সম্পূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

ড. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

হাজার কবিতার ডুয়ার্স

শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে (২৬ জুন, ২০১৬) ‘হাজার কবিতার ডুয়ার্স’ বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। তার প্রধান কারণ বইটির বিপুল আয়তন, যা আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে সামলে ওঠা সম্ভব হয়নি। শেষ প্রহরে জেগে ওঠার মতো কবিদের পাঠানো কবিতার বন্যায় আমরা, বলতে দ্বিধা নেই, খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ডুয়ার্সের ১২৫ জন কবির মোট এক হাজারের বেশি কবিতা নিয়ে বইটির সম্পাদনার কাজ শেষ হয়েছে। প্রায় ৬৫০ পাতার হার্ডবোর্ড বাঁধাই বইটি আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের হাতে এসে পৌঁছাবে। বইটির দাম ধার্য করা হয়েছে ৫০০ টাকা। কবি-বন্ধুরা অবশ্য প্রথম দু’টি কপি পাবেন একটির দামেই। প্রকাশের দিনক্ষণ ধার্য হলে প্রত্যেক কবিকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো হবে।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় খেলাধুলা বিভাগে ‘কে হবেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব?’ লেখাটিতে প্রতিবেদকের নাম ভুলবশত মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য লেখা হয়েছে। লেখাটি আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক শশাঙ্ক ভট্টাচার্য-র। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

পর্যটকের ডুয়ার্স

বর্ষায় জয়ন্তি

যে ব্যবসায়িক কোম্পানিতে চাকরি করি, সেটি মোটেও সুবিধের নয়। বিশেষ করে আমার উপরেই যিনি আছেন, সেই সেল্‌স ম্যানেজারটিও ততটাই বদমেজাজি। ফোনে যখন গালাগালি করেন, তখন মাঝেমধ্যেই কান্না পায়। কিন্তু দুটো কারণে চাকরিটা ছাড়ার কথা ভাবতে পারি না। এক, আর কিছু এই বয়সে জুটবে না। দুই, সেই বদমেজাজি বস দু'মাসে একবার যখনই উত্তরবঙ্গ টুরে আসেন, দু'দিনের রগড়ানির শেষে উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে দু'রাতের জন্য কোনও একটা রিসর্টে চলে যান। এই দুটো রাত তিন দিন তিনি একেবারে অন্য মানুষ। সকালে আমাকে ঘুম থেকে তুলে কাপে চা ঢেলে চিনি গুলে এগিয়ে দেন। তারপর হাতে ক্যামেরা নিয়ে হাঁটতে বেরন। যত রাজ্যের ফুল আর পাখি— সবার নাম ওঁর জানা। কখনও কখনও খোলা গলায় গেয়ে ওঠেন দু'কলি গান। সারাটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যায়! ফেরার সময় বুঝতে পারি, বাকি দু'মাস কাজ করার এনার্জি আমার মধ্যে ভরে দিয়ে গেলেন।

গত মাসের মাঝামাঝি যখন উনি টুরে এলেন, কলকাতায় দাবদাহ চলছে আর ডুয়ার্সে অবিরাম বর্ষণ। বর্ষায় বেরনো দায়, বিক্রিও প্রায় বন্ধই। স্বাভাবিক কারণেই উনি এসে বাপবাপান্ত করতে ছাড়লেন না। বললেন, এবার আমার চাকরিটা খেয়েই উনি নাকি ক্ষান্ত হবেন। আমি তো ভয়ে কাঠ। শেষমেশ রেগেমেগেই বললেন, কাল ভোরে বেরব। জয়ন্তি শুনেছি এবার খোলা আছে। নতুন টুরিস্ট লজে ক'টা দিন কাটাব। বিশাল একটা পাথর যেন বুক থেকে নেমে গেল।

শুনেছি মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় জয়ন্তি বনবাংলোর কাছেই তৈরি হয়েছে পর্যটন নিগমের রিসর্টটি। ঘরগুলি চমৎকার। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা বলাই বাহুল্য, ভাল। সবচেয়ে ভাল বনবাংলোর ছাউনিতে বসে জয়ন্তি নদীর বুকে ধুম বর্ষা দেখা।

এ সময় প্রজাপতির মেলা বসে জয়ন্তির ঝোপঝাড়ে। বৃষ্টি থামতেই আমার বস সেসব নিয়েই ব্যস্ত রইলেন সারা দুপুর। সন্ধে হতেই মশার ধূপ জ্বালিয়ে বারান্দায় বসে রাম খেতে খেতে পুরনো দিনের সব বিদঘুটে গান। পাশে একটি কটেজে একদল ছোকরা এসেছিল, তারাও ঘন্টাখানেক আড্ডা দিয়ে গেল। বর্ষায় ডুয়ার্সের এমন মোহিনী রূপ, যে নেশা ধরিয়ে দেয়। প্রকৃতির কামনা যেন তুঙ্গে উঠেছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক আর রাস্তার অর্ধেক দখল করা লতাপাতা যেন আদিম বাসনার কথা ঘোষণা করছে, যে ডাক উপেক্ষা করা অসাধ্য।

তন্ময় পাল

ছবি: প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

ডুয়ার্সের ডিশ

পনিরের পুর দেওয়া কাঁকরোল

উপকরণ- কাঁকরোল ৪টে, পনির ২০০ গ্রাম, কালো সরষে বাটা ৩ চামচ, কাঁচা লংকা আন্দাজমতো, ময়দা ৬ বড় চামচ, চালের গুঁড়ো ৬ বড় চামচ, বেসন ৪ বড় চামচ, সাদা তেল আন্দাজমতো।

প্রণালী- প্রথমে কাঁকরোল লম্বালম্বি দু'টুকরো করে অল্প ভাপিয়ে নিন। এবার কাঁকরোলের ভেতরের বীজগুলো বার করে নিন। বীজগুলো আন্দাজমতো সরষে, লংকা, চিনি, নুন দিয়ে একসঙ্গে বেটে নিন। পনির ম্যাশড করে কড়াইতে অল্প সরষের তেল দিয়ে তাতে বাটা মশলা আর পনির দিয়ে একটু নেড়ে পুর তৈরি করুন। ময়দা, চালের গুঁড়ো আর বেসন মিশিয়ে তার মধ্যে অল্প নুন, চিনি, তেল দিয়ে, ময়ান দিয়ে পেস্ট বা ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটারে এমন আন্দাজে জল দেবেন, যাতে খুব বেশি ঘন কিংবা খুব বেশি পাতলা না হয়ে যায়। এখন কাঁকরোলের ভেতর পুর ভরে ব্যাটারে চুবিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলুন। পরিবেশন করুন গরম গরম কেয়া বাত কাঁকরোল।

রেশ ভট্টাচার্য

LIC
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
১২ বছরের বিশ্বস্ত নাম
Arajit Lahiri (Raja)
Zonal Manager Club Member for Agent
Contact for Free Consultancy & Servicing
- LICI Agent
- Housing Finance Ltd. Agent
- Mortgage Loan
- Premium Deposit
- NEFT Registration
- Nominee Changes
- All Type of Loan
সারা বছর আপনাদের সঙ্গে
9932103350, 9832452859
arajit45@gmail.com

হুল দিবস

সাঁওতালি ভাষায় হুল শব্দটির অর্থ হল বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতিকে স্মরণ করে কোচবিহারে হয়ে গেল হুল উৎসব। স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৩০ জুলাই ও ১ জুন দু'দিনব্যাপী এই উৎসব পালিত হল। বিভিন্ন আদিবাসী নৃত্যগীত ছাড়াও একটি ছোট্ট চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল, যাতে সংক্ষেপে সাঁওতাল বিদ্রোহের গোটা ঘটনাটা বর্ণনা করা রয়েছে সাধারণ দর্শকদের জন্য। অনুষ্ঠানে সাংসদ রেণুকা সিনহা, বিধায়ক মিহির গোস্বামী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা ডাকুয়া, উপস্বাস্থ্য আধিকারিক শ্যামলকুমার সোরেন, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রবালকান্তি ঘোষ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের শহিদ সিধু, কানহু, চান্দ, ভৈরবসহ প্রচুর আদিবাসীর বলিদানকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের সংস্কৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরার প্রশাসনের এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

উদীচী নাট্য সংস্থার 'ত্রিংশ শতাব্দী'

কে বলেছে জলপাইগুড়ি থেকে নাট্যচর্চা উধাও হয়ে গিয়েছে? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় এরকমই একটা উদাহরণ সবার চোখের সামনে মেলে ধরল 'উদীচী' নাট্য সংস্থা। গত ১২ জুন তারা মঞ্চস্থ করল বাদল সরকারের নাটক 'ত্রিংশ শতাব্দী'। নাটকটির প্রেক্ষাপট ও মূল বিষয়বস্তুটি অসাধারণ। হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়াবহ ফলাফলের পর ত্রিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ কী জবাবদিহি করবে, তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা এই নাটকের বক্তব্য।

হালকা নাটক না হওয়ায় একঘেয়েমির যে সম্ভাবনা থাকে তা অভিজিৎ নাগের পরিচালনার গুণে কোনওভাবেই প্রকাশিত হয়নি। বাদল সরকার রচিত এই নাটকটির বহুলচর্চিত আবেদন ইদানীংকালে না থাকলেও শান্তির বার্তা চিরকালীন। সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রেক্ষাপট তৈরি করার জন্য মুখবন্ধে যে পাঠটি করা হয়েছে, সেটি প্রাসঙ্গিক হলেও শেষে সেই সুতোর রেশ থাকলে ভাল লাগত বলে মনে হয়।

অভিনয়ে অনুশীলনের ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ করে যাঁদের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, তাঁদের মধ্যে আছেন— শরৎ চৌধুরীর ভূমিকায় অভিজিৎ নাগ, কর্নেল ফেরেবির ভূমিকায় শুভেন্দু চক্রবর্তী, মিসেস ইথারলির চরিত্রে দৃশিতা চক্রবর্তী, ডঃ ওসাদার ভূমিকায় ডালিয়া চৌধুরী, এনেমন কাওয়াগুচির ভূমিকায় কল্যাণ সেন। তবে বাকিরাও প্রত্যেকেই তাঁদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ঢেলে দিয়ে অভিনয় করেছেন। থার্ড ফর্মে যেসব শিল্পী অভিনয় করে গিয়েছেন নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তাঁদের কথা না বললে অন্যায় হবে। প্রায় প্রত্যেকেই নতুন শিল্পী। কিন্তু তাঁদের একনিষ্ঠতা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। কোথাও কোথাও ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি যে একেবারেই চোখে পড়েনি এমন নয়। সেদিকে একটু নজর দিলে আরও ভাল হয়।

যেমন, শরৎ চৌধুরীর উচ্চারণ কোথাও কোথাও জড়িয়ে যাওয়ায় বুঝতে অসুবিধে হয়েছে। শরৎ এবং বিজ্ঞানীর অভিনয়ে শেষের দিকে একটু হলেও একঘেয়েমি এসেছিল বলে মনে হয়েছে। তবে সব দিক থেকে বিচার করলে নাটকটি যে দর্শকদের কাছে উত্তীর্ণ হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই।

শ্বেতা সরখেল

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

সে দিন 'আড্ডাঘর'-এ টেবিল ফাটিয়ে জোর তক্ক চলছিল। বিষয়— দেবতা বনাম প্রধানমন্ত্রী। আলোচনা যখন তুঙ্গে, তখন আচমকা এক তার্কিক বলে বসলেন, 'এত যে তক্ক করছেন আপনারা— বলুন তো, ডুয়ার্সের কোন বর্তমান দেবতার সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ফারাক মোটে এক অক্ষরের?'
শুনে সবাই খুব ভাবতে শুরু করল। আমি কিন্তু উত্তরটা জানতাম। আপনারা জানালে স্রেফ মিলিয়ে নেব মাত্র!

২

'খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিন কোথায় গোড়াতে ঠান্ডা আছে।'
কথাটা লেখা ছিল একটা পুকুরের পাশে। প্রথমে ভেবেছিলাম নির্ঘাত কোনও পাগলের কাণ্ড। পরে মনে হল, এটা একটা প্রহেলিকা। তারপর মনে হল, আরে! সেখানে তো আমি গিয়েছি! এবার আপনারা বলুন, কোথায়?

৩

ম্লেচ্ছ ভাষায় Fun হল মজা করা। তবে 'হিন্দি তুই কোন গাঁও যাস মজা করতে?'— এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে? না পারলে অশ্বঘোষের টীকা খুলে জেনে নিতে পারেন।

গতবারের উত্তর— ১) বিজনবাড়ি
২) ভাওয়াইয়া

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

এখন ডুয়ার্স-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন

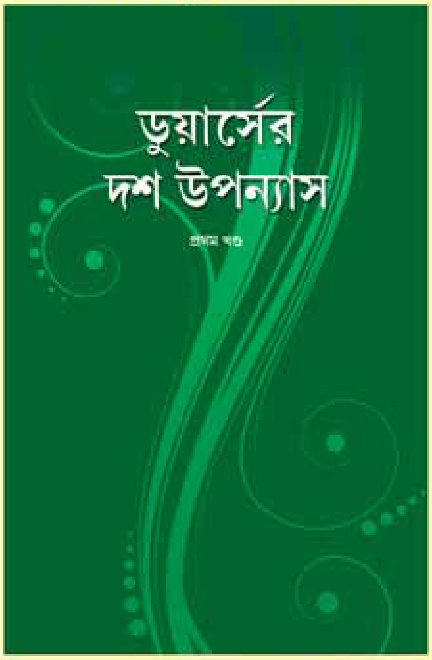

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা।

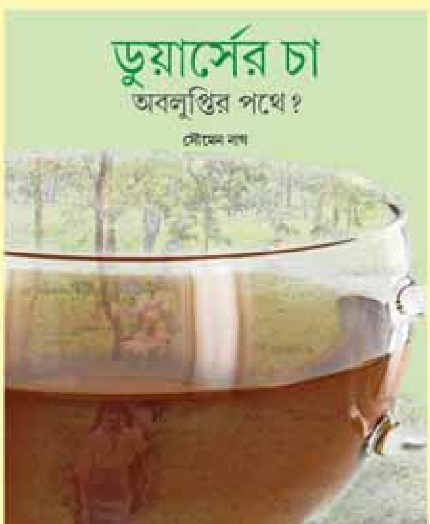

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ মূল্য ১৫০ টাকা।

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

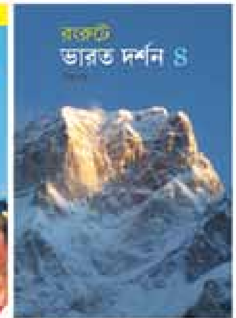

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

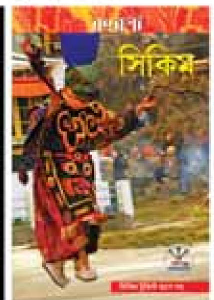

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ।
মূল্য ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

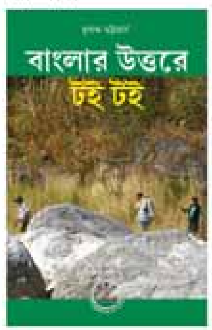

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

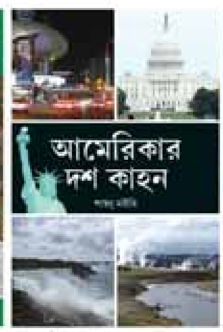

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

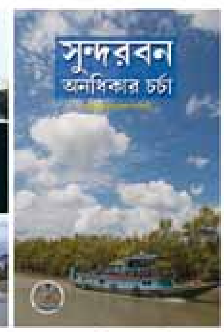

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

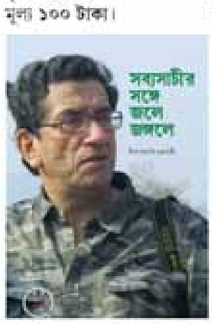

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

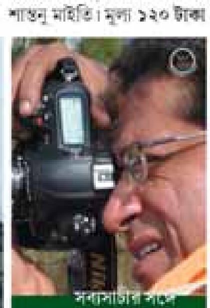

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-3 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ABACUS & Brain Gym
A Brain Development Training for your Child

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত হবে ঃ

- অংকে পারদর্শিতা
- মনোযোগ
- স্মরণশক্তি
- আত্মবিশ্বাস
- কল্পনাশক্তি
- আত্মনির্ভরশীলতা
- উপস্থিত বুদ্ধি
- উপস্থাপনা
- মেধা ও প্রতিভা
- গতি ও নির্ভুলতা

ENGLISH LEARNING PROGRAM FOR ALL AGE GROUP

SpeakWell

Enabling You to Speak English Confidently & Fluently

Reading Writting Listening Speaking

Starter
AGE 4 to 7

- ✓ PHONICS & READING.
- ✓ SPEAK FLUENTLY.
- ✓ GRAMMAR & SENTENCES.
- ✓ CONVERSATION SKILLS.
- ✓ SPELLING & VOCABULARY.
- ✓ WRITING & TYPING.
- ✓ BECOME AN INDEPENDENT READER.

Junior Age 8 to 12 | **Active** Age 13 to 17 | **Fluent** Age 18+

Vedic Mathematics
an ancient system for fast & easy calculation

কিছু কৌশল যা অংককে আরও তাড়াতাড়ি সমাধান করতে সাহায্য করে।

Your Child can solve these mentally?

2679502/43 in 12 secs

1412 × 14 in 5 secs

18% of 120 in 4 secs

$(965)^2$ in 5 secs

$\sqrt[3]{11852352}$ in 20 secs

Age 12+

Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Percentage, L.C.M, H.C.F, Square & Cube Roots All In 30 Seconds.

Learn Science Through Hands-on-Activity.

FUN SCIENCE LAB
EXPERIENCE SCIENCE... HANDS-ON !

More than 35 Science Activities & Experiments...

Air, Water, Sound, Light, Magnetism, Force, Energy, Balancing, Solar System, Human Body

Lemon & Potato Battery, Periscope, Balancing Doll, String Phone, Jumping Frog Sun Dial, Rainbow Jar, Lava Lamp, Water Cycle in a Bag, Balloon Car, Invisible Ink ,Soap Boat, Catapult, Hovercraft, Anemometer, Fountain in Bottle, Solar System Model, Seed germination and many more...

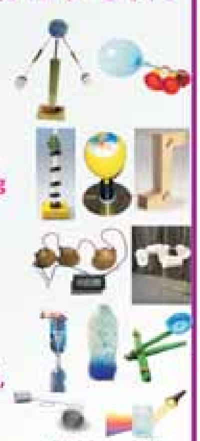

20 Sunday program... Every Sunday 2 hours

Only for the student of Class III to V

All Material given on Take-Home basis

ABACUS TEACHER'S TRAINING

We are offering excellent opportunity to associate and earn throughout your life by training children...

Ideal for Educated Housewives, Graduates, Unemployed or any Energetic individuals...

✓No Franchise Fee. ✓High Earning Potential.
✓Break Even Starts Within 3 to 6 Months.

Contact Us to Join FREE WorkShop or DEMO Class

99330 21080 / 97320 00665

SCA STAR CAREER ACADEMY

Charuprobha Bhawan, KADAMTALA, JALPAIGURI

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.